# মেঘমেদুর

# মেঘমেদুর

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী



চলন্তিকা প্রকাশক • কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ

জন্মাষ্টমী

১৩৬৬

প্রকাশক :

শ্রীতপনকুমার চৌধুরী

১২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

প্রচ্ছদ শিল্পী :

ব্রজেন চৌধুরী

মুদ্রাকর :

শ্রীগণেশপ্রসাদ সরাফ্

দি অশোক প্রিন্টীং ওয়ার্কস

১৭।১, বিন্দু পালিত লেন

কলিকাতা-৬

দাম দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

## উৎসর্গ

*মা থাকতেও শৈশবে ও কৈশোরে যাঁর কাছে মায়ের অধিক স্নেহ পেয়েছি, আমার সেই 'আয়িমা' স্বর্গতা সুভাষিণী দেবীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—*

লেখক

এই লেখকের :

কাব্যগ্রন্থ—কলকল্লোল

শূন্য প্রান্তরের গান

জীবনীগ্রন্থ—সন্ন্যাসী একা যাত্রী

# ভূমিকা

শ্রীমান্ শিবদাস চক্রবর্ত্তী ইতিপূর্ব্বে 'কলকল্লোল' নামে একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করেছেন। 'মেঘমেদুর' তাঁর প্রথম গল্প-পুস্তক। বাংলা গল্প সাহিত্যের আসরে তিনি নবাগত প্রবেশার্থী হলেও বহুজনে ভর্ত্তি আসরের মধ্যেও তিনি অতি সহজেই আপনার স্থান করে নিতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। 'পথে-প্রান্তরে', 'ভগিনী' ও 'ধ্যানভঙ্গ' নামক গল্প-গুলিতে গল্প আছে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ আছে। ছোট গল্পের রচনাভঙ্গী অনুযায়ী 'ভগিনী' গল্পটি একটি সুন্দর গল্প। সমস্ত গল্পগুলির মধ্যেই এমন একটি সহজ স্নিগ্ধতা বিদ্যমান যা অতি সহজে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে তোলে। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে গল্প বলার সহজ ভঙ্গীটিও লেখক অতি চমৎকার আয়ত্ত করেছেন। তাঁর এই প্রথম গল্প সংকলন নিয়ে গল্পলেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে তাঁর সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। তাঁর রচনা রসগ্রাহী পাঠকের কাছে অনাদৃত থাকবে না বলে বিশ্বাস করি। ইতি—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

# আমার কথা

এই সঙ্কলনে আশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে একটি ছাড়া অন্যগুলি বিভিন্ন সময়ে 'মন্দিরা', 'বঙ্গশ্রী ( অধুনালুপ্ত )', 'জয়শ্রী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত। 'ধ্যানভঙ্গ' আমার লেখা প্রথম গল্প এবং এটি 'মন্দিরা'র এক শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এক সময়ে এক প্রকাশনী-সংস্থার আনুকূল্যে একখানি গল্প-পুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলাম। তখন আমার একখানি মাত্র কবিতার বই বেরিয়েছে। গল্পের জগতে একান্ত অপরিচিত। তাই একখানি ছাড়পত্রের সন্ধানে দুঃসাহসী হয়ে পরম শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কাছে কতকগুলি গল্প নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। গল্পগুলি পড়ে তিনি সানন্দে কয়েক ছত্র আশীর্বাণী দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের দরুণ সে প্রকাশনী-সংস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে কিছুদূর অগ্রসর হয়েও আমার সে গল্প-পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমার অন্য দু'একখানি বই বেরিয়েছে। কিন্তু গল্প-পুস্তক প্রকাশের আর সুযোগ হয়ে ওঠে নি। আজ 'চলন্তিকা প্রকাশক'এর আন্তরিক উদ্যোগে আমার অনেক দিনকার ব্যর্থ প্রয়াস সার্থক হতে চলেছে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা

সত্ত্বেও এবং গল্পের বইয়ের বাজার মন্দা জেনেও তাঁরা আমার প্রতি যে সহানুভূতি ছাখালেন তার জন্যে চলন্তিকা প্রকাশকের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলার গল্প-সাহিত্য এতদিনে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে অথচ সে জগতে আমি এখনও আগের মতোই অপরিচিতনামা। তাই তারাশঙ্করকে প্রণাম জানিয়ে সযত্নে-রাখা তাঁর সেই আশীর্বাণী ভূমিকাকারে এই সঙ্কলনের সঙ্গে সংযোজিত করলাম। গল্পগুলি যদি গল্পরসপিপাসু সহৃদয় পাঠককে কিছু পরিমাণে আনন্দ দিতে পারে তা'হলে আমার প্রয়াস সার্থক মনে করবো।

এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতি পর্ব থেকে সমাপ্তি-পর্ব পর্যন্ত যার সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ আমাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছে, আমার সঙ্গে মধুর সম্পর্কে সম্পর্কিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্যানুরাগী সেই শ্রীমান্ নয়নেন্দু সুন্দর মুখোপাধ্যায় (খোকন) এর নাম সস্নেহে উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

এই সুযোগে আমার সমস্ত শুভানুধ্যায়ীকে নমস্কার। ইতি

লেখক

জন্মাষ্টমী ১৩৬৬

# মেঘমেদুর

হুস্ হুস্ হুস্ হুস্··–

ট্রেনখানা শব্দ করে স্টেশন ছেড়ে গেল।

ওকি মালগাড়ীর শব্দ না এক্সপ্রেস? শব্দটা তো একটানা মনে হয় না। তা হলে বোধহয় ওটা মালগাড়ী নয়, এক্সপ্রেসই হবে।

ধড়মড় করে উঠে গৌরী দেয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে ছাখে—পৌনে পাঁচটা। কী বিশ্রী ঘুমে পেয়েছিল তাকে। সেই একটা-দেড়টার সময় শুয়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে। এক ঘুমে একেবারে পৌনে পাঁচটা। মনে মনে একটু লজ্জা পেলো সে।

বাইরে ঝুলবারান্দায় এসে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গৌরী চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

আষাঢ় মাস। মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়া, মধ্যে মধ্যে বিজলীর ঝলকানি। উধাও মেঘেরা দল বেঁধে কোথায় ছুটে চলেছে কে জানে, না-পাওয়ার অভিসারে কি পেয়ে-হারিয়ে-যাওয়ার আবিষ্কারে। আষাঢ় আকাশে মেঘ দেখলে যেন না-পাওয়াকে পেতে সাধ জাগে, পাওয়াকে আরও নিবিড় করে পেতে ইচ্ছা হয়, পেয়ে-হারিয়ে যাওয়াকে নিয়ে রচনা করতে ইচ্ছা করে বেদনার অনুষ্টুপ্ ছন্দে মরণজয়ী প্রেমগীতা।

গৌরী ঘরের মধ্যে ফিরে আসছিল, সহসা নীচে থেকে শুনতে পেলো মায়ের ডাক—ওরে গৌরী, রেবাদের বাড়ীতে গেলিনে ?

—না মা, আমার যেতে ইচ্ছা করছেনা।

—ও বেলা সে এত করে তোকে বলে গেল। তুই বললি যাবি ; এখন না গেলে সে-ই বা কী মনে করবে আর জামাই বা কী ভাববে !

—আর একদিন যাবো।

—না হয় গিয়ে একখানা গানই শুনিয়ে আয়। রেবা তার স্বামীর কাছে তোর গানের খুব সুখ্যাতি করেছে। যা', মা যা'। স্নেহমাখা সুরে মা মেয়েকে বুঝিয়ে বলেন।

—আগে জানলে আজ আমি যেতে রাজী হতাম না।

—কেউ শুনতে চাইলে শোনাবিনে, তবে গান শিখিস্ কেন ? মেয়ের বারংবার অস্বীকারে মায়ের মনে বিরক্তি জাগে।

—কেন, জানোনা বুঝি আজ মাস্টার মশায় আসবার দিন ? গৌরী ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো সওয়া পাঁচটা।

—তা হোক্। এলে আমি বলে দেবো। তাঁর সিটিং তো আর নষ্ট হচ্ছে না।

মায়ের কথা ক'টি কাঁটার খোঁচার মতো বিঁধলো তার বুকে। হোন্ না তিনি টাকা-দিয়ে রাখা মাস্টার, তাই বলে কি তাঁর সম্মান রাখা উচিত নয় ? এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে শহর থেকে এই মাইলখানেক হেঁটে এসে শুনবেন—সে গান শেখা বন্ধ

রেখে গান শোনাতে গেছে। ছিঃ ছিঃ! এমন কী-ই বা সে শিখেছে যে ঘটা করে অপরকে শোনানো যায়। মাস্টার মশায়ের কণ্ঠস্বর, তাঁর খ্যাতি, সরল ব্যবহার মূর্তি ধরে ওঠে তার মনের মধ্যে। মায়ের কথায় সায় দিতে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যায়।

—আজ থাক্ মা। আমার শরীরটাও ভালো লাগছে না। জোর করে গাইলে গান খারাপ হয়ে যাবে।

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে সে খানিকক্ষণ অকারণে এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়ালো। তারপর ঘড়ির দিকে আরেকবার তাকিয়ে বাক্সটা খুলে হারমোনিয়মটা খাটের উপর রাখলো। পাশে টেবিলের উপরকার বইয়ের গাদার নীচে থেকে গান শেখার খাতাখানি বের করে রাখলো তার উপর।

খাতাখানির উপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা দু'টি ছত্র—

মন দিয়ে যে নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে তাই চরণ ছুঁয়ে যাই।

মাস্টার মশায়ের হাতের লেখা। কতদিন কতবার সে পড়েছে। মর্মার্থ হয়তো বোঝেনি, তবু বাছাই-করা কথা ক'টি পড়লে তার সুর কানে জড়িয়ে থাকে।

বাইরে তখন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়া সুরু হয়েছে। আবহাওয়ায় বেশ একটু শীতের আমেজ। শরীর খারাপের ভান করবার জন্যে গৌরী একখানা পাতলা কাঁথা গায়ের উপর টেনে নিয়ে খাটের একপাশে শুয়ে পড়লো।

পূব দিকের ঘর। বাড়ীটার চারিপাশ গাছপালায় ঘেরা। শুয়ে শুয়ে তার নজর চলে যায় অনেক দূরে। ঝিরঝিরে বর্ষার জলকণা গাছের পাতার উপরে পড়েছে। মনে হয় গাছের সারা শরীর যেন শিউরে উঠেছে কোন্ পথ-চাওয়ার গোপন স্মরণে।

—শরীর অসুস্থ যখন, থাক্না আজ তবে গান শিখে দরকার নেই।

একটা আওয়াজ ভেসে আসে নীচে থেকে। একটি সাদরে-শোনা চেনা-চেনা পুরুষকণ্ঠ তার মার সঙ্গে কথা কইছে। গৌরী গা থেকে কাঁথাটা সরিয়ে কান খাড়া করলো।

—এসেছেন যখন যাবেন কেন, উপরে যান, জিজ্ঞাসা করে দেখুন গান শিখবে কিনা। ওবেলা ওর এক বন্ধু এসে নেমন্তন্ন করে গেল ওদের ওখানে যেতে। ওর স্বামীকে গান শোনাবে। সকালে বললে যাবে, এখন বলছে যাবে না।

এবার গৌরীর আর বুঝতে বাকী রইলো না তার মাস্টার মশায়ের কণ্ঠস্বর।

-আচ্ছা, যাচ্ছি আমি উপরে।

– হ্যাঁ যান। সব কাজে ওর খামখেয়ালী। পইপই করে বলি যে বাপু, বিয়ে-থাওয়া না হওয়া পর্যন্ত গানটা যত্ন করে শেখ্, তারপরে তো হাঁড়ি ঠেলতে হবে।

— তোমার নাকি অসুখ করেছে ?

—কৈ না তো ? গৌরীর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের প্রকাশ।

—তবে তোমার বন্ধুর ওখানে গান শোনাবার কথা দিয়ে গেলে না কেন ?

গৌরী হারমোনিয়মের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে আঁচলের কোণার কাপড় আঙুলে জড়াচ্ছিল আর খুলছিল। মাস্টার মশায়ের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে চট করে তাঁর মুখের পানে একবার চেয়ে নিল। দেখলো তাঁর মুখে হাসি। সে হাসির খোঁচা বিঁধলো গিয়ে তার বুকে।

— আমি যেতে চাইনি ; রেবা ছাড়ে না, না যেতে চাইলে মা-ও রাগ করেন। ছাত্রীর গলাটা কেঁপে উঠলো।

—তাতে হয়েছে কী ? কেউ শুনতে চাইলে ভালো তৈরী গান দু'একখানা শোনাবে বৈ কি ! তাঁর মুখের হাসিটা যেন আরেকটু রাঙিয়ে উঠলো।

—না। গেলে আগেই যেতাম। এ ধরনের প্রশ্ন সে আশা করেনি। ভেবেছিল তার না-যাওয়াতে মাস্টার মশায় খুশীই হবেন।

- তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো। আজ পুরানো গানগুলো ঠিক করে নাও।

মাস্টার মশায়ের আদেশ পেয়ে সে হারমোনিয়মের সামনে গিয়ে বসলো।

- কোন্‌খানা গাইবো ? গৌরী হাসি-হাসি মুখে মাস্টার মশায়ের মুখের দিকে চাইলো।

—ঐখানা— ঐ 'তোমার সুর শুনায়ে'।

গৌরীর মুখে অলক্ষ্যে হাসি এসে গেল। মুখ ফিরিয়ে সে-ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে হারমোনিয়মটা কাছে টেনে নিল। তার মনে পড়ে এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতখানি বহুদিন তিনি ফরমাশ করে শুনেছেন। এখানা নাকি ওর মুখে শুনতে খুব ভালো লাগে। গৌরী সসঙ্কোচে একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করে ; উনি বুঝিয়ে বলেন—সব গান সবার মুখে সমান ওতরায় না। প্রত্যেকের একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে ; সেই প্রকৃতি যে গানের মধ্যে মুক্তি পায়, সেখানেই মেশে প্রাণের দরদ ; আর প্রাণের দরদের ছোঁয়া লাগলেই গান হয়ে ওঠে জীবন্ত। গান শেষ হলে মাস্টারমশায় চেয়ে দেখলেন ছাত্রীর মুখখানা আনন্দে রাঙা হয়ে উঠেছে।

—আচ্ছা, এবার তুমি একখানা নিজের ইচ্ছামতো গাও।

ছাত্রী মুখ নীচু করে রইলো। তার বড়ো সাধ আজ একখানা বর্ষার গান শেখে। মন বলি-বলি করে, সঙ্কোচে বলা হয় না। কোনোদিন ফরমাশ করে চায় নি। আজ চাইলে যদি তিনি রেগে যান।

দেখলো মাস্টারমশায় অন্যমনস্ক। সাত পাঁচ ভেবে মনে জোর এনে বলেই ফেললো আজ একখানা বর্ষার গান শিখবো।

—বর্ষার গান ? আচ্ছা, দাও খাতা।

গানখানি খাতায় লিখে সেখানা ছাত্রীর সামনে রেখে তিনি

শোনাতে লাগলেন। আষাঢ় মাসের অমর আকুতি-মাখা তার পদোবন্ধ ঃ

নীল নভোতলে নবঘন ভারে
এলো যে আষাঢ় মাস ;
বিরহ-যক্ষ-অভিশপ্ত হে,
কোথা কবি কালিদাস।

তাঁর নিজের সুর-দেওয়া গান। অনির্বচনীয়ের আভাস-ভরা আত্মার আকুতি থেকে জন্ম। একবার গেয়ে আবার গাইলেন। ছাত্রী শুনে চলেছে। একটি হৃদয় ভালো-লাগার সুড়ঙ্গ পথে আরেকটি হৃদয়ের অভিসারে ছুটেছে। অত সুর কি দু'কানে শুনে শেষ করা যায় ? সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যদি শোনবার শক্তি থাকতো ?

দুবার গাওয়া হলে মাস্টারমশায় হারমোনিয়মের সঙ্গে ছাত্রীর গলায় গানখানি তুলে দিলেন। বহুবার ভুল করে বহুবার চেষ্টা করে সে গানখানি শিখে নিল।

আচ্ছা, এবার পুরানো একখানি গান গাও।

খাতার পাতা উল্‌টে উল্‌টে ছাত্রী একখানি গান বের করে গাওয়া সুরু করলো ঃ

মঙ্গল শঙ্খের গম্ভীর মন্দ্রে
সুন্দর, আজি তোমা অন্তর বন্দে।

গায় আর ফাঁকে ফাঁকে মাস্টার মশায়ের দিকে চায়। কালোপানা গায়ের রঙ, খয়ের-রঙা হাফ-সার্ট গায়ে। চুলগুলি

উল্টো করে আঁচড়ানো। আসনপিঁড়ি হয়ে বসা ; ডান হাতখানা ডান উরুর উপর সোজা উঁচু করে রাখা। হাতের তালুর উপর কপালটা ভর দিয়ে রেখে চোখ বুজে তিনি গান শুনছেন আর বাঁ হাত দিয়ে তাল দিচ্ছেন।

একটু অন্যমনস্ক হওয়াতে স্থুর ভুল হয়ে যায়, লয়টা ঈষৎ ঝুলে পড়ে। অমনি মনে মনে লজ্জা পেয়ে সে সাবধান হয়ে গাইতে আরম্ভ করে ঃ

চঞ্চল চিত্তের উচ্ছল নৃত্য,
শঙ্কিত সঙ্গীত অশ্রুতে সিক্ত,
অর্ঘ্যের পাত্রে তা' ভরেছি আনন্দে।—

গৌরী তাঁকে প্রথম ছ্যাখে এক জলসায়। সেদিনও উনি এইভাবে আসরের একপাশে বসে ছিলেন। পাশে একজন খেয়াল-গাইয়ে সাগ্‌রেতের হাতে তানপুরা দিয়ে হাত পা ছুঁড়ে দাঁত মুখ ভেঙচিয়ে স্থুরের সঙ্গে আস্থুরিক সংগ্রাম করছিলেন। স্বরের দৈন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তৎপরতা দিয়ে পূরণ করবার চেষ্টা। আসরেরও তু'একজন মুখ ফিরিয়ে হেসে নিচ্ছিল। তিনি নির্বিকারভাবে চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিলেন। স্থুরের মধ্যে যেন ডুবে গেছেন। গান শেষ হলে শ্রোতামহল থেকে ব্যঙ্গের হাত-তালি, অসম্মানের বাহবা পুরস্কার এলো। আসরের আশে-পাশের লোক নীরব থেকে তাতেই যেন মৌন সায় জানাণো। কেবলমাত্র উনি প্রাণখোলা হাসি হেসে খেয়াল-গাইয়েকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন- বাঃ! বাঃ! ওস্তাদজী ; সাধনা কাকে বলে!

সে একদিন কথায় কথায় ওঁর কাছে সেই আসরের কথা তুলে খেয়াল-গাইয়ের নিন্দে করে হেসেছিল। ধারণা ছিল উনিও হয়তো সে হাসিতে যোগ দেবেন। কিন্তু ফল উল্টো হলো। রাগে গম্ভীর হয়ে উনি বললেন---কখনো আমার সামনে কোনো গাইয়ের নিন্দা কোরো না। শিল্পীর নিন্দা শিল্পকে অসম্মান করা। গলা ঈশ্বর-দত্ত জিনিস; সবারই একরকম হয় না। ওঁর হয়তো তা' নেই; কিন্তু যে কঠোর সাধনা করেছেন উনি তাকে শ্রদ্ধা করতে শেখো। নইলে তোমার কিচ্ছু হবে না।

অসহায়ের মতো হাতের কাছে কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে সে বলেছিল, কিন্তু উনি যে আপনার নিন্দে করেন, আমার বন্ধু হাসির কাছে বলেছেন, ও কি গান জানে না কি? ভারী দু'খানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর আধুনিক গান শিখেছে।

-- ওটা নিন্দা নয়, সত্যি কথা। আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তো সত্যিই জানি নে। উনি যা' জানেন তাতে ওঁর কাছে আমি অনেক দিন শিখতে পারি। পেটের দায়ে গানের মাস্টারি করি, আসলে তো আমি তোমাদের মতোই শিক্ষার্থী।

মাস্টারমশায়ের দিকে চেয়ে গান গাইতে গিয়ে গৌরীর সেই সব কথা মনে পড়ে যায়। যে প্রকাশ্যে তাঁকে অস্বীকার করতে চায়, জেনেও তিনি অপ্রকাশ্যে তাকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। সেই থেকে গৌরী তাঁর কোনো জবাব দিতে গেলে সমঝে দেয়। পাছে কোনো কথার অন্য রকম অর্থ হয়ে যায়।

—পুরানো গানগুলো এরকমভাবে ভুলে বসে আছ। তবে নতুন গান শিখে খাতা ভর্তি করে লাভ কী? ভুলে-ভরা দশখানা গান জানার চেয়ে একখানা নির্ভুল গান জানার দাম বেশী। বেশ বিরক্তির সুরেই মাস্টারমশায় বললেন।

ছাত্রী নিরুত্তর হয়ে মুখ নীচু করে রইলো।

—তোমার মা-বাবা টাকা দিয়ে মাস্টার রেখেছেন, মেয়ে যে ক'খানা বেশী শিখে নিতে পারে তাতেই তাঁদের লাভ। কিন্তু শিল্পী হয়ে নিজেও কি তুমি বোঝোনা ওর মধ্যে কতবড় ফাঁকি?

ছাত্রীর চোখ মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। তার বসতে পারলো না সেখানে। কোলের উপরে পড়ে-থাকা আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বসুন, আমি আসছি।

নাঃ! মেয়েদের যত্ন করে গান শিখিয়ে কোনো লাভ নেই। ওরা গানের জন্যে গান শেখে না। ওটা ওদের কাছে অন্য কিছু পাওয়ার পথ পরিষ্কারের প্রস্তুতি। মাস্টারী জীবনে কত মেয়েকেই তো তিনি গান শিখিয়েছেন। কৈ, এমন একটি মেয়ের কথাও তো মনে পড়ে না যে শিল্পের জন্যে একটু কষ্টকর সাধনা করে, একটু ত্যাগ দিয়ে সাধনার গতিকে এগিয়ে নিতে চায়। যে আনন্দে ওরা নতুন শাড়ী ব্লাউজ পরে, সেই আনন্দেই নতুন গান শেখা। দু'দিনেই পুরানো হয়ে যায়, অনাদরে মন থেকে ঝেড়ে ফ্যালে। শুধু এই মেয়েটার মধ্যে দেখেছিলেন একটু ব্যতিক্রম। প্রথম প্রথম এর নিষ্ঠা তাঁকে খুশী করেছিল। পরীক্ষা

আসন্ন; মা-বাবা বললেন, এখন কয়েকদিন গান বন্ধ থাক। গৌরী তা না শুনে গানের পেছনে নির্দিষ্ট সময়টুকু ব্যয় করতে কার্পণ্য করেনি। ফলে পরীক্ষায় একটা বিষয়ে ফেল করলো। মা-বাবা গালাগালি করতে লাগলেন। সে বললো, পড়াশুনোয় আমার উন্নতি হবেনা, আমি উন্নতি করবো গানে। এ ব্যাপারটা গৌরীর মা-ই মাস্টার মশায়কে বলেছিলেন। মাস্টার মশায় পরীক্ষায় ফেল করার জন্যে মুখে দুঃখ প্রকাশ করলেও মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন। কিন্তু আজ কোথায় সে ধারণা? যেদিনই পুরানো গানগুলো পরীক্ষা করতে গেছেন সেইদিনই দেখেছেন ওর ভুল হয়ে যায়। নাঃ! গড়ে এ-ও সাধারণের দলে।

একা একা বসে তিনি চেয়েছিলেন বাইরের দিকে। দরিদ্র মাস্টারী জীবনের তিক্ত স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে বেসুর জাগিয়ে তুলছিল।

সহসা পায়ের শব্দে চেয়ে ছাখেন— গৌরী। এক হাতে একটা রেকাবী-ভরা কাঁঠালের কোয়া, আর এক হাতে একটা কাঁচের গ্লাসে জল।

নিঃশব্দে মাস্টারমশায়ের ডানদিকের টেবিলের উপরে রেখে সে বেরিয়ে গেল।

গৌরী —

—আমি চা নিয়ে আসছি। গলার আওয়াজটা ক্রমশঃ দূরে সরে গেল।

সহসা পারিপার্শ্বিক আঘাতে তাঁর সে ভাবটা কেটে গেল। আলগোছে রেকাবীর উপর থেকে একটি একটি করে গোটাচারেক কোয়া তুলে নিয়ে খেয়ে সেটি সরিয়ে রেখে দিলেন। বর্ষাশ্রী-সুন্দরী প্রকৃতির মৌন প্রভাব তাঁর মুখে গানের ছন্দে গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো ঃ

জগতে কোথা কেহ নাহি আর,
আঁধার নিরজন চারিধার।
দু'জনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।

সমস্ত ঋতুর মধ্যে বর্ষার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। বর্ষার পরিবেশে মনটা আপনা থেকেই নিজের মধ্যে ফিরে আসে। একটা গোপন সঙ্গ-লালসায় মন লোলুপ হয়ে ওঠে। কিছু চাওয়া নয়, শুধু চেয়ে থাকা, কিছু পাওয়া নয় শুধু পেতে চাওয়া, কিছু লেখা নয় শুধু দেখে যাওয়া, কোনো কথা নয় শুধু ব্যাকুলতা।

চা এসে গেল।

মাস্টারমশায় ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন· বড়ো দেরী করে ফেললে। আমার আজ রাত্তিরে আর এক জায়গায় কাজ সেরে ফেলতে হবে।

—চা-টা খান ; ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে আগের কথার খেই ধরেই তিনি বলে যেতে লাগলেন তোমাদের বাড়ীটা এত দূরে, যেতে আসতে যে সময় যায় তাতে আমার আরেকটা টুইশনি হয়ে যায়।

জানো তো দু'দিনের জন্যে কোলকাতা থেকে আসি। অল্প সময়ে সব টুইশনি করা কষ্টকর হয়।

এ কথার কী জবাব দেবে সে? সাধারণতঃ যে পারিশ্রমিক উনি নিয়ে থাকেন, তার চেয়ে তো ওরা কমই দেয়। সে কথাটা এ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে লাভ কী? কথার মোড় ফেরাতে গিয়ে বললো—আজ আপনার যেতে কষ্ট হবে। এখনো যেমন বৃষ্টি পড়ছে।

—শুধু আজ কেন? ভরা বর্ষা তো এখনো সামনে। প্রত্যেকদিনই দুর্ভোগ ভুগতে হবে। পেয়ালাটা নামিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে তিনি ছাত্রীর মুখের দিকে চাইলেন।

'দুর্ভোগ' কথাটা বড়ো বেসুরো শোনালো তার কানে। কাঁপা-কাঁপা গলার স্বর আরো কেঁপে উঠলো—কী করবো, বাবা গরীব মানুষ, শহরে বাড়ী করতে পারেন নি।

—আচ্ছা, এক কাজ করোনা কেন? মনিবাবুর কাছে গান শিখবে? এদিকে তাঁর আরো টুইশনি আছে। তা' ছাড়া তিনি এখানেই থাকেন।

ছাত্রী নিরুত্তর।

—আমি ঠিক করে দেবো। আমাকে যা দাও তাতেই হয়ে যাবে।

উনি কি ব্যঙ্গ করছেন? ওঁর কি মনে নেই তার মনিবাবুর কাছেই প্রথম গান শেখার কথা হয়েছিল? কিন্তু সে খেয়াল শিখতে রাজী হয়নি। বাবাকে বলে শেষ পর্যন্ত এঁর কাছে

শেখাই সুরু করে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় এঁর মুখে শোনা প্রথম গানের প্রথম ছত্রটি :

কী গান আমারে

বলো যে গাহিতে

নাহি জানি।

সে সুরের রেশ এখনো কানে জড়িয়ে আছে। আর পাশাপাশি মনে পড়ে মনিবাবুর গমক তান তুলবার সময়কার মুখচ্ছবি। ভাঙা গলা থেকে বিকট একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে, হাঁ করে গালের মধ্যে জিভ বেঁকিয়ে যেন কাকে কামড়াতে যাচ্ছেন। কোন্ পত্রিকায় একটা কবিতা পড়েছিল সে, তাও মনে এসে যায় :

যে-গান গাহিতে গেলে ছোটে কালঘাম,
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সেই 'ক্লাসিক্যাল' নাম।

এত দুঃখের মধ্যেও সে ফিক্ করে হেসে ফেললো।

—কী হাসলে যে ?

লজ্জা পেয়ে তার মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটু সামলে নিয়ে বলে—ওঁর গান আমার ভালো লাগে না। ক'দিনই বা গান শিখছি, না শিখলেই বা কী ?

মাস্টারমশায় বুঝতে পারেন, ছাত্রী দুঃখিত হয়েছে তাঁর প্রস্তাবে। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন—আচ্ছা, আমার গান যদি আর কাউকে দিয়ে শেখানোর ব্যবস্থা করে দিই ?

গুরুতর প্রশ্ন। গৌরী ভাবলো যদি বলে—না, তা'হলে

তাঁর গানের অসম্মান করা হবে। তাঁর এতদূর এলে যখন ক্ষতি হয়, তখন কোন্ অধিকারেই বা সে জোর করে আসতে বলে। অনুগ্রহ দাবিরও তো একটা সীমা আছে।

মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে জানালো, তার সম্মতি আছে।

—তাহলে আসছে সপ্তাহ থেকে আমার এক বন্ধু এসে তোমাকে গান শিখিয়ে যাবেন। টাকা লাগবে না।

ছাত্রী নীরব। ডান হাঁটুর মালার উপর থুতনী রেখে নিজের পায়ের আঙুলের দিকে চেয়ে রইলো।

—তোমার বাবা তাকে চেনেন। সে গানের মাস্টারি করেনা, তবে আমার অনেক গান তার জানা আছে। তোমাকে শেখাতে পারবে। কথাগুলি গুছিয়ে বলতে মনটা অলক্ষ্যে একটু অগোছালো হয়ে গেল। ছাত্রী তাঁর প্রস্তাবে এত সহজে রাজী হয় এটা যেন তিনি মনে মনে চাননি। প্রাণকে পরাজিত করে গান পেলো স্বীকৃতি!

—আপনি আসবেন তো মাঝে মাঝে? নিমেষের জন্যে সে মাস্টারমশায়ের দিকে মুখ তুলে চাইলো। তাঁর চোখের কাছ থেকে যেন সে একটা উত্তর প্রত্যাশা করছে।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে······যদি দরকার হয়······জোর করে টেনে-আনা এক টুকরো হাসির আলোয় মুখের ম্লানিমাটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়নি তখনো; সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে।

মাস্টারমশায় আর একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

—ছাতা এনে দেবো ? উঠে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ছাত্রী জিজ্ঞাসা করলো।

—না, থাক্, তুমি বসো। এটুকু দুর্যোগে ভয় করলে চলবে কেন ?

—কড়্-কড়্-কড়াৎ—কানে-তালা-ধরানো শব্দে মেঘ গর্জে উঠলো। হঠাৎ-আলোর-ঝলকে চারিদিক আলোময় হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার দ্বিগুণ হয়ে এলো।

—একটু বসে যান্‌না। মনের সমস্ত দরদ ছোট্ট একটি মিনতির মধ্যে ভাষা পেলো।

—দুর্যোগ বাড়বার আগেই সরে পড়া ভালো।

মাস্টারমশায় বেরিয়ে পড়লেন। অন্ধকারের আড়ালে কেউ কারো মুখ ভালো করে দেখতে পেলোনা।

কিছুক্ষণ পরে মা এসে গৌরীকে বললেন—আজ নতুন কী গান শিখলি, গা দেখি।

—এখনো তা' শোনাবার মতো হয়নি।

—আরে বাপু, যেটুকু পারিস্ গা' না। তোর ঢঙ্ দেখলে আমার গা জ্বালা করে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার মায়ের পীড়নে সে হারমোনিয়মের সামনে গিয়ে বসলো। আপ্রাণ চেষ্টা করলো গানের সুরটা পর্দায় বাজিয়ে তোলার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই সে গানের সুরের

এক বর্ণও মনে করতে পারলো না। নিরাশ হয়ে হারমোনিয়মটা সরিয়ে রেখে বললো—সুর ভুলে গেছি।

শহরের কোনো ক্লাবের সান্ধ্য আসরে সেদিন গানবাজনার বেশ আয়োজন ছিল। মাস্টারমশায় টুইশনি থেকে ফিরে এসে সেখানে গিয়ে উঠলেন। নানা ধরনের নানা গান হলো। তাঁকেও একখানি গাইতে হলো ঃ

আমায় নহে গো ভালোবাসো, শুধু
ভালবাসো মোর গান,
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে
গান হলে অবসান।

সুরের আবর্তে আবর্তে অকপট দরদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।
—বাঃ! বাঃ! বাঃ! এই রকম না হলে গান? আহ্বান এলো আরেকখানি গাইবার।

আজ আর পারছিনে। এতদূর ট্রেনে চেপে এসেছি; ক্ষমা করবেন। কাল আবার শোনাবো।

মাস্টারমশায় হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন।

# পথে-প্রান্তরে

সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যতীন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

মা, ছোটবোন এবং নিজে---এই তিনটি প্রাণীর ছোট্ট একটি সংসারের একমাত্র ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল সে।

যতীনের ইচ্ছা সে আরো পড়ে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গোপন ইসারা তার তরুণ মর্মে আনে আনন্দের দোলা। আরো অন্ততঃ দু'টো পাস করতেই হবে। নইলে এই বেকার-সমস্যার যুগে সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালককে কে-ই বা চাকরি দেবে।

মা এসে বললেন—আর পড়ে কী হবে বাবা? একটা পাস করেছিস্ তো; লোকে আর মুখ্খু বলতে পারবে না। এখন একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নিয়ে তোর ঘর-সংসার তুই গুছিয়ে নে। লক্ষ্মীও যাটের বয়স্থা হয়ে উঠেছে। ওরও বিয়ে-থাওয়া এখনই দেওয়া দরকার! পাড়াগেঁয়ে সমাজের মুখ তো আর কেউ চেপে ধরতে পারবে না। আমি আর এমনি করে পরের বাড়ী ধান ভেনে ক্ষুদ-কুঁড়ো এনে কতদিন তোদের মানুষ করবো।

চাকরি---কি চাকরি সে এই বিদ্যা নিয়ে করবে। পেলেও পনের-কুড়ি টাকার বেশী মাইনে কেউ দেবে না। তাও সুপারিশ, ধরাধরি দরকার। বি.এ. পাস করেও পঁচিশ-ত্রিশ টাকার চাকরি করছে এমন লোকেরও অভাব নেই। যুদ্ধে গেলে হয় তো কিছু বেশী মাইনের চাকরি জুটতে পারে। কিন্তু সংসারের এক ছেলের পক্ষে তা' সম্ভব নয়।

অথচ তার মায়ের দুঃখ মোচন করাও একান্ত কর্তব্য। বিধবা হবার পর তাঁর স্বচ্ছল সঙ্গতিসম্পন্ন ভায়েরা তাঁকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছিলেন; আত্মসম্মানপরায়ণা তিনি, তাই ভাই-বৌয়ের গলগ্রহ হতে চাননি। ছোট ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নিজের গতর ঘামিয়ে ক্ষুদ-কুঁড়ো এনে কোনমতে স্বামীর ভিটেয় পড়ে আছেন। ছেলেকে একটা পাসও করিয়েছেন। বড়ো হয়ে ছেলেই বা চোখের সামনে কেমন করে অত কষ্ট দ্যাখে।

ভবিষ্যতের স্বপ্নে রঙ্ আছে, কিন্তু বর্তমানের কঠোর বাস্তবের কালিমা তাতে ঢেকে যায় না।

ছেলে মায়ের কথার কোন উত্তর দেয় না। মা বোঝেন সে পড়া ছেড়ে দেবার কথায় মনে ব্যথা পায়। পড়াশুনোয় সে খারাপ নয়। সমস্ত বই কিনে সে পড়তে পারেনি। সহপাঠীর বই দেখে হাতে লিখে নিয়ে পড়েছে এবং তাতেও পরীক্ষায় সে ভালই করেছে; প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার আশা সে অন্ততঃ আর দু'টো পাস করবেই। আশেপাশের তিন-

চারখানা গ্রামের মধ্যে তিনটে পাসকরা লোক আছে মাত্র আর তিনজন। তাঁদের নাম উচ্চারণ করে গ্রামবাসীরা গর্ব অনুভব করে। সবাই এঁদের কারো সঙ্গে না কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্র আবিষ্কার করে লোকের কাছে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করে। যতীনের ইচ্ছা সে-ও ঐ তিনজনের পাশে একজন হবে।

কিন্তু মা বোঝেন তা অসম্ভব। গরীবের পক্ষে যা হয়েছে সে-ই যথেষ্ট। তিনি কথাটা ঘুরিয়ে বলেন ছ্যাখ্, পয়সাকড়ি না থাকলে লেখাপড়ায়-ই কি মান বাড়ে? তোর মামারা তো একটা পাসও না। একজন উকিল সেরেস্তায় কাজ করে, একজন গ্রামের বাজারে দোকান দেয়। তবু তারা আজ ছু'পয়সা করেছে বলে অনেকেই তাদের বাড়ীতে ওঠা-বসা করে।

শেষ পর্যন্ত বাস্তবকে মেনে নেওয়া ছাড়া যতীনের গত্যন্তর রইলো না। গ্রামের জমিদারের কাছারীর নায়েব মশায়কে ধরাধরি ক'রে একটা অবৈতনিক শিক্ষানবিসি মিললো। মাস-ছয়েক বাড়ীর খেয়ে কাজকর্ম শিখলে একটা কাজ জুটতেও পারে। যতীন একরকম আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। এ নিয়েও পাড়ার ছু'চারজন বিচক্ষণ প্রবীণ-প্রবীণারা জল্পনা করতে কসুর করলেন না।

দীর্ঘ ছু'মাস ধরে যতীন একটি নিরন্ধ্রপ্রায় দালানের মধ্যে বহুজনের পদরজমাখা চাদর-পাতা একটি খাটের উপর বসে সামনে একটি হাতবাক্স রেখে তার উপর নানাপ্রকারের কাগজ

লিখে চললো। তারপর নায়েব মশায়ের সহানুভূতি ও নিজের যোগ্যতার সুপারিশে ঐ ডিহিতেই বারো টাকা মাসিক বেতনে একটি তহশীল-সহকারীর পদ পেলো।

জমিদারের রাজস্ব আদায় করতে সে যায় গ্রামে গ্রামে। দারিদ্র্যের কদর্যতা-মাখা অর্ধনগ্ন প্রজারা এসে তাদের দুঃখ জানায়। সুদ মাপের আবেদন করে। কেউ কেউ খাজনা মকুব চায়।

যতীন শোনে। খাজনা পরিশোধের উপকারিতা বুঝিয়ে বলে কিন্তু পীড়ন করতে সম্ভ্রমে বাধে।

সে জমিদারের প্রতিনিধি। জমিদার,—সে শুনে এসেছে বাপ-মায়ের মতো। সুতরাং কেমন করে তাদের দুঃখদৈন্যকে উপেক্ষা করে নিজের স্বার্থকেই বড়ো করে দ্যাখে। ফলে জোর-জুলুম করলে যেমনটি আদায় হতো তা' হয় না।

তহশীলদার বিচক্ষণ ব্যক্তি। কাজ উদ্ধারের জন্যে ভেদনীতি, দণ্ডনীতি—প্রয়োজন মতো কোনোটারই আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আদায় খারাপ হচ্ছে দেখে তিনি সহকারী বালকের আত্মার মধ্যে তাঁর স্বীয় সাধনাপুষ্ট আত্মিক শক্তি সঞ্চারের ছলে বলেন—নরম হয়োনা বাপু, ব্যাটারা জমিদারের খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে আর খাজনা দেবে না? ওরা কি ভালো মুখের পাত্তর? জুতিয়ে ওদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

কথাগুলো যতীনের কানে বেসুরো শোনায়। জমিদারের খেয়ে ওদের প্রাণ বাঁচে, না, ওদের খেয়ে জমিদারের প্রাণ বাঁচে! যে প্রজারা মমতা দিয়ে মাটির পরিচর্যা করে তারা মাটির মালিক, না জীবনে যাদের গাঁয়ের মাটীতে পা পড়ে না তারা মাটির মালিক! রোদ জল তুচ্ছ করে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যারা চাষ করে, দেশের লোকের আহার জোগায়, জমিদারের বিলাসের খোরাক দেয়, অনাহারের সম্মুখীন হয়েও যদি তারা একবার খাজনা দিতে না পারে তাহলে জমিদারের কাছ থেকে কি তাদের প্রাপ্য—লাঠি, গাল আর জুতো?

ফাল্গুন গিয়ে চৈত্র এলো। সামনেই তামাদী। জোর মতো আদায় না হলে নালিশ দায়ের করতে হয়; তাতে জমিদারের ঘর থেকে নালিশী খরচার বাবদ অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। তাই এই সময় প্রয়োজন মতো জমিদারেরা ডিহি পরিদর্শনে আসেন। ফলে, ভয়ে ভয়ে প্রজারা যথাসাধ্য আদায় দেয়।

যতীনদের এই ডিহিতে বড়ো তরফের একজন জমিদার এলেন পরিদর্শনে। প্রজাদের ডাক হলো। তহশীলদার ও তাঁর সহকর্মীর আদায়ের পরিমাণ খতিয়ে দেখা গেল একই গ্রামে তহশীলদার গেলে যা' আদায় হয়, তাঁর সহকারী গেলে তার সিকি পরিমাণ হয়। মাতব্বর প্রজাদের ডেকে জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন কেন আদায় এমন খারাপ হচ্ছে। দু'তিনজন জবাব

দিলো—যতীনবাবু ছেলেমানুষ, প্রজাদের কড়া কথা বলতে পারেন না, তার আদায় হবে কী।

যতীনের তলব হলো। কম্পিত পদক্ষেপে যতীন জমিদারবাবুর সামনে হাজির হলো। নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখে মুখে ধমক না দিয়ে তিনি বললেন তুমি এখন এ চাকরি করতে এসেছো কেন খোকা? মন দিয়ে চারপাঁচ বছর শিক্ষানবিসি করো, ডিহির কাজের হালচাল শেখো; তারপর এসো, চাকরি পাবে। তহশীলদারের কৈফিয়ত তলব হলো কেন এমন দায়িত্বপূর্ণ পদে একজন বালককে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আশার দীপ জ্বলতে না জ্বলতে নিভে গেল। তার চাকরি গেল।

বেকার হয়ে যতীন বাড়াতে এসে একটি পাঠশালায় শিক্ষকতা সুরু করলো। অভাবের সংসার তবু যা' দু'-পাঁচ টাকা আসে। সাত আট মাস এইভাবে কাটলো।

জলভরা কালো মেঘের সংঘর্ষেই চমকে ওঠে বিজলীর আলো-শিখা।

হাল না ছেড়ে যতীন আবার নানা প্রকার চেষ্টা করতে লাগলো। চেষ্টা করতে করতে অন্য একটি জমিদারির দূরবর্তী এক ডিহিতে সহকারী তহশীলদারের চাকরি জুটলো। এবার স্থায়ী চাকরি। পূর্বার্জিত স্বল্প অভিজ্ঞতার উপর ভর দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

গ্রামের নাম নারায়ণপুর।

কাছারীবাড়ীটি চারিপাশে আম কাঁঠাল গাছের সারি দিয়ে ঘেরা; প্রাঙ্গণে সবুজ ঘাসের শ্যামোচ্ছ্বাস। অনতিদূরে একটি ক্ষীণতোয়া নদী, দু'পারে বালুচর। বর্ষাকালে এই চর জলে ভেসে যায়। উপরের ডাঙায় বাবলা গাছের বন, মধ্যে মধ্যে রসস্রাবশীর্ণ দু'-একটি খেজুর গাছ।

পাশেই বাজার; দু'বেলা বাজার বসে। কাছারীবাড়ীর সামনের ছোট পথ দিয়ে তিন-চার মাইল দূর থেকে লোকে বাজার বেসাতি করতে আসে, কাছারীবাড়ীর শ'খানেক গজ দূরে দক্ষিণে বাঁশবন-ঘেরা একাংশে জেলেপাড়া, তার পিছনে মুসলমানপাড়া।

নদীর পাড় দিয়ে একপেয়ে একটা সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে মিশেছে। মাঠটি বিস্তর বিস্তৃত। সমগ্র প্রান্তরের বুক জুড়ে অধিকারের আধিপত্য বিস্তার করে দাঁড়িয়ে একটি শাখাজটিল বটগাছ। কাছে অন্য কোনো বড়ো গাছের চিহ্ন নেই শুধু ঐ বটগাছের বিপুল ছায়াতলে নিশ্চিন্তে কয়েকটি ভাঁটি ও আশ-শেওড়ার গাছ পিতৃসঙ্গবিহারী পুত্রের মতো দাঁড়িয়ে।

যতীনের মন মুক্তি পায় এই গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে। বিশেষ করে এখানে এসে সে একজন বন্ধু পেয়েছে; তাঁর সস্নেহ প্রীতি তার মনে অপূর্ব সজীবতা এনে দিয়েছে। তিনি স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

দিনান্তের কাজ শেষে যতীন একা একা নদীর ধারে গিয়ে বসে। দূর ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা থেকে পদ্মা ও গড়াই নদী পেরিয়ে অনেক মালবাহী নৌকা এই নদীতে আসে। পশ্চিমের গোধূলি-আকাশ থেকে গাঢ় লালিমার আবেশ এসে লাগে নৌকাগুলির সাদা পালে, ঝিরঝিরে হাওয়ায় সেগুলি কাঁপতে থাকে; বসে বসে সে ছাখে। অন্তর তার সুদূরের মধুর আভাসে ভরে ওঠে।

কোনো কোনোদিন বন্ধু এসে তাকে ডাকেন। দু'জনে মিলে বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধার বেয়ে সেই মাঠের মধ্যে গিয়ে হয়তো বটগাছটির সামনে বসে।

চারিদিকে ধূসর ধূলির আস্তরণ; দৃষ্টি যেখানে শেষ হয়ে আসে, সেখানে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় তরুণ আখবন সমোচ্চতা রক্ষা করে প্রান্তরের প্রহরা দিচ্ছে।

চারিদিকে চেয়ে যতীনের বন্ধু আবেগ-ভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করে উঠেন-

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়া বটে,
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীর তলে।
চলে কিনা চলে

ক্লান্ত স্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মতো।

কত জীবন-মৃত্যুর, কত ভাঙা-গড়ার, কত দিনরাত্রির স্মৃতি-বিস্মৃতির সাক্ষ্য ঐ বটগাছ। যতীন ও তার বন্ধু সেখানে বসে বসে নানা দিনের আপন আপন সুখদুঃখের কাহিনী বলাবলি করে।

অস্তে-চলা সূর্যের শেষ রক্তরাগ গোধূলির আকাশখানি রাঙিয়ে তোলে। তারা চেয়ে ছাখে। যতীনের বন্ধুর কণ্ঠে শব্দিত হয়ে ওঠে---

মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে। দূর প্রান্তরের সীমানাশায়ী গ্রামের নিরালা কুটিরে মাটির দীপ জ্বলে ওঠে। শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের আলোয় বনরেখা ধূম্রবর্ণ ধারণ করে। দিন-রাত্রির মহামিলনের আলিঙ্গন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আকাশের তারায় তারায়।

দেখতে দেখতে যতীন বলে ওঠে--দেখেছেন পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে? সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের কোনো সত্যদ্রষ্টা ঋষি হয়তো এমনিতরো এক সন্ধ্যায় ধ্যানলীন মনে পশ্চিমের পানে চেয়ে মহাদেবের মূর্তি কল্পনা করেছিলেন। এই ধূম্রবর্ণ বনরেখা যেন মহাদেবের পিঙ্গল জটাজুট, তৃতীয়ার চাঁদ ললাটের চন্দ্রলেখা।

যেদিন আদায় করতে মফঃস্বলে যেতে না হয়, সেদিন যতীন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার ঘরের জানালা ক'টি খুলে হয়তো একখানি বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। হয়তো বা একটু শুয়ে পড়ে।

শোবার ঘরে পূবদিক দিয়ে নদীর ধারমুখো একটা সরু পথ গেছে এঁকেবেঁকে। বেলা পড়ো পড়ো হলে গাঁয়ের জেলেপাড়ার মেয়েরা সারি বেঁধে জল আনতে যায়। ঘোমটাপরা বৌ ও কুমারীরা গালগল্প করতে করতে পথ চলতে থাকে। কারো বাঁকাখলিতে শূন্য কলস, ডান কাঁখে সুকুমার শিশু। কেউ ছেলে সোহাগ করে, কেউ কেউ পরস্পরের কার বাড়ী কী রান্না হয়েছে আলোচনা করে। কেউ কেউ স্বামীর সোহাগের কার্পণ্য নিয়ে পারস্পরিক অভিযোগ জানায়।

সবার মধ্যে একটি কিশোরী সহস্র চাঞ্চল্যে সারা পথকে চকিত করে তোলে। নাম তার আহুরী। চলতে চলতে একবার সে সবার আগে যায়, আবার পিছনে পড়ে। অকারণ হাস্যেলাস্যে আসন্ন যৌবনের মাতাল আনন্দের আভাসকে সে মুঠি ভরে পথে ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

কাছারিঘরের পাশে একটা ঝুমকো লতার গাছ। আহুরী সহসা পিছনে পড়ে তাড়াতাড়ি সেই গাছে ওঠে। দু'গাছা ফুল পেড়ে নিয়ে একটি নিজের খোঁপায় গোঁজে, অপরটি পরিয়ে দেয় তার বৌদির খোঁপাতে।

যতীন শুয়ে শুয়ে ছাখে।

পল্লীবধূদের এই জল-আনার ছল একটা ক্ষণিকের মুক্তির প্রয়াস। তাই তারা কলসীতে জল থাকলেও ছল করে জল ফেলে জল আনতে যায়। ঘাটে যাবার পথে সকলে মিলে মিশে সংসারের সুঃখ-দুঃখ, দাম্পত্য জীবনের হর্ষ-বিষাদভরা দিনপঞ্জীর আলোচনা করে একটু স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে।

জল আনার পালা শীগ্‌গীরই শেষ হয়ে যায়। কুলবধূরা এক একবার জল নিয়েই যে যার বাড়ী ফিরে যায়। আদুরীর জল আনা কিন্তু সহজে সারা হয় না। দেহের অনুপাতে দীর্ঘায়ত একটি কলসী কাঁখে নিয়ে বহুবার তাকে এই পথেঘাটে যেতে হয়।

রুক্ষ চৈত্রের ক্ষুব্ধ অভিশাপে এদিককার মাটি ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে, কূয়োর জল যায় শুকিয়ে। বিজ্ঞানের শুভাশিস-বঞ্চিত এই অঞ্চলের গরীব লোকের প্রাণ বাঁচে ঐ ক্ষীণতোয়া নদীর দীর্ণ বক্ষের খিন্ন অমৃতধারায়। ধনীদের বাড়ীতে যে দু'একটি নলকূপ আছে, এরা তার সুবিধা পায় না।

আদুরী কাছারিঘরের সামনে এসে ঝুমকো লতার গাছের কাছে কলসীটি রেখে চারিদিকে ছাখে কোথাও পেয়াদা আছে কি না। কাউকে দেখতে না পেলে তাড়াতাড়ি সে গাছে উঠে ফুল ছিঁড়তে থাকে।

যতীন সরলা কিশোরীর গতিভঙ্গী লক্ষ্য করে, কখনো একটু হাসে। পরস্পর চোখাচোখি হলে আদুরীও ফিক করে হেসে ফেলে গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। তারপর কলসীটা কাঁখে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে যায়।

যে-পথে আতুরী ঘাটে যেতে থাকে যতীন সেই দিয়ে চেয়ে দেখতে থাকে।

এ শুধু একদিনকার নয়, আতুরীর এই কর্মধারা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। যতীন এই মেয়েটির হাবভাবের মর্ম বুঝতে পারে না। তবু তার মন্দ লাগে না। বি-ধর্মী তারুণ্যের লীলাহিল্লোল তার মনে বেশ একটু আমেজ বয়ে আনে। এর আগে সে আর কোনো মেয়ের সান্নিধ্যে আসেনি। আতুরীর হাবভাব তাই ইসারায় যতীনকে টেনে নিয়ে যায় নূতন কিছু আবিষ্কারের পানে।

সন্ধ্যা লাগে লাগে। তামাদীর আসন্ন। সারাদিন যে টাকা আদায় হয়েছে যতীন নিজের ঘরের খাটের উপর উপুড় হয়ে তার হিসাব মিল করছিল। সহসা গায়ের উপর নরম কী পড়ায় যতীন চমকে উঠে দেখলো এক গোছা ঝুমকোলতার ফুল। মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে ছাখে একটি মেয়ে মধ্যে মধ্যে পিছন ফিরে চাইতে চাইতে দৌড়ে যাচ্ছে।

কাছারিবাড়ীর কাছেই জেলেপাড়া। সেখানেই আতুরীদের বাড়ী। আতুরীর বাবা রতন মালো ভিটেবাড়ীর প্রজা। জমিদারের নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করে। কাছারীর বাঘরেশে নায়েবমশায়কে খুশি রাখবার জন্য ভালো মাছ পেলে কখনও কখনও কাছারীতে ভেট পাঠায়।

মেয়েকে দিয়ে রতন মালো একদিন একটি ঝাঁকায় ভরে

কতকগুলি তাজা শিঙ্গী মাছ আর শোল মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে।

আতুরী ঝাঁকাটা হাতে নিয়ে কাছারীর সামনে এসে ছ্যাখে নায়েবমশাই কাছারিঘরের মধ্যে প্রজাবেষ্টিত হয়ে বসে গড়-গড়ার নল মুখে দিয়ে ধূমপান করছেন। না বলে আতুরী ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। নায়েব মশায়ের শিকারী দৃষ্টি আতুরীর উপর পড়লো। তিনি বললেন—যাও, বাসার ভিতর দিয়ে এসো।

বাসার ভিতর এসে সে কাউকে ছ্যাখে না, কাকে ডাকবে ভেবে পায় না। শূন্য চাহনি চারিদিকে ছড়িয়ে একেবারে সে ঘরের দরজায় দিকে এগিয়ে যায় আবার সঙ্কোচে পিছিয়ে আসে।

—কে ?

পরিচিত কণ্ঠস্বর। আতুরী চমকে উঠে বাঁ হাত দিয়ে গায়ের কাপড়টা ঠিক করে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

যতীন বেরিয়ে এসে বললো—কী ওতে, মাছ ? কী মাছ দেখি। এগিয়ে এসে সে ঝাঁকার দিকে চাইলো।

যতীনের এত সান্নিধ্যে সে হতভম্ব হয়ে গেল। মুখখানা নীচু হলো, সে যেন কাঁপতে লাগলো।

—এর দাম কত ?

আতুরী বিব্রত হয়ে পড়লো। অসহায় অবস্থার থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে সে বলে উঠলো—আমরা আপনাদের পিরজা। বাবা আপনাগের খাতি দেছেন।

জবাবের অপেক্ষা না করে ঝপ্ করে মাছগুলো মাটিতে ঢেলে দিয়ে আতুরী ঝাঁকাটা মাথায় করে দৌড় মারলো।

এইভাবে যতীনের চাকরির একটি বৎসর কেটে গেল।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি। মেঘলা আকাশ থমথমে। মধ্যে মধ্যে অনিবার বর্ষণ। মরাগাঙে আবার জোয়ার জেগেছে, নদীর জল ফুলতে সুরু করেছে। তার মূক মুখের মুখর ভাষণে দুই তীর চমকিত।

একদিন দুপুরবেলা ঝরঝর ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যতীন রান্নাঘরে খেতে বসেছে, তহশীলদারবাবুও খেতে বসেছেন তার পাশে। এমন সময় একটি ছেঁড়া ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে ডাকহরকরা একখানি লম্বা খামের চিঠি নীচ থেকে রান্নাঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল।

খেতে খেতেই চিঠিখানা হাতে তুলে তহশীলদারবাবু বললেন—হুঁ! সদরের চিঠি। কে জানে হয়তো টাকার তাগিদ।

মুখ ধুয়ে তহশীলদারবাবু চিঠিখানি পড়তে লাগলেন। যতীন বিস্মিত চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে তিনি বললেন — তোমার এখান থেকে কপাল উঠেছে।

হতভম্ব যতীনের হাত থেকে গ্রাসের ভাত পড়ে গেল। সে অন্তরে শিউরে উঠলো। তবু আশাবাদ মনে রেখে প্রশ্ন করলো— বদলীর খবর না কি?

—হুঁ, তুমি খেয়ে নাও। গম্ভীরভাবে তিনি চিঠিখানি খামে পুরলেন।

সদরের জরুরী চিঠি। এই ডিহিটি জমিদারের জমিদারী স্বত্বের অধীন নয়, পত্তনী মহালের অন্তর্গত। মহাল লাভের না হওয়ায় জমিদার উপরিস্থ মালিকের খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। উপরিস্থ মালিক রুষ্ট হয়ে মামলা রুজু করেন। দু'পক্ষের তদ্বিরের আতিশয্যে ও জিদে নিম্ন আদালত থেকে সে মোকদ্দমা সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত ওঠে। শেষে উপরিস্থ মালিক জয়ী হন। ফলে সমস্ত পত্তনী মহালই জমিদারের হাতছাড়া হয়ে গেল। এই ডিহিও আর রইলো না। যতীনের চাকরি গেল। তহশীলদার-বাবু বহুদিনকার অনুগত কর্মচারী, সেজন্যে তাঁকে অন্য ডিহিতে বদলীর ব্যবস্থা করা হলো।

খেতে খেতে যতীন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এই জায়গা ছেড়ে যাবার কথা তার যত মনে জাগে ততই মন তার ব্যথাতুর হয়ে ওঠে।

সে ভাবে, মাটির কি মায়া! মাটি চিরদিনই খাঁটি, চিরদিনই মা। সন্তানকে স্নেহডোরে বাঁধতে তার আয়োজনের অভাব হয় না। নইলে একবছর আগে যে মাটি ছিল একান্ত অজানা, কেমন করে সে এ ভাবে তাকে এত অল্পদিনে আপন করে নিল।

দুপুরের বিশ্রামের পর তহশীলদারবাবু যতীনকে সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন শোনো একটি কথা আছে।

যতীন এগিয়ে এলো। তিনি বলতে লাগলেন—ছাখো, এখন বড় হয়েছ। জীবনে উন্নতির পথে হয়ত অনেক বাধা-বিঘ্ন আসবে। মনে হবে সুদিন বুঝি আর আসবে না। কখ্খন মুষড়ে পড়ো না। ছুঃখের মধ্যেও সত্যকে আঁকড়ে থেক। ছুঃখ চিরদিন থাকবে না। তুমি পারবে। তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ করি। এ পথ তোমার নয়।

যতীন হঠাৎ এ ধরণের কথার মর্ম বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। তহশীলদারবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে তোমার বয়সী হতো। সাত বছর বয়সে সে মারা যায়। একমাত্র ছেলের শোক সইতে না পেরে তার মাও সে বছরে মারা যায়। আবার সংসারে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল। আবার বিয়ে-থাওয়া করতে হলো। আজ আমি চারিটি সন্তানের পিতা। ছু'টি শালাকেও ঐ সঙ্গে মানুষ করতে হয়। জমিদার বেতন দেন মাসিক পনের টাকা। কী করবো, প্রাণের দায়ে ছ্যাচড়ামি ধাপ্পাবাজি সবই করতে হয়। আগে মিথ্যে কথা বলে কারো কাছ থেকে পয়সা-কড়ি নিলে মনে খোঁচা লাগতো। বারবার মিথ্যা বলতে বলতে আজ আর সে বোধ নেই। ছু'মুঠি অন্নের জন্যে শেয়াল-কুকুরের মতো উঞ্চবৃত্তি করি। উপায় নেই বাপু। মানের উপরে আজ প্রাণের দাবী বড়ো। জ্ঞানপাপী আমরা বাপু, এ পাপের ক্ষমা নেই।

যতীন বিস্মিত হয়ে পড়ে। অর্থ আয়ের জন্যে যাকে নানা

ছলনার সাহায্য নিতে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত তার মধ্যে একটি জাগ্রত বিবেক বর্তমান।

তহ্শীলদারবাবু যতীনকে কোলের কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকেন—তোমার মুখের আড়া আমার সেই ছেলের মতো। তোমাকে দেখলে আমার তার কথা মনে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি যতীনের হাতে সদরের চিঠিখানি তুলে দিলেন। চিঠি পড়তে পড়তে তাঁর শরীর কাঠের মতো কঠিন হয়ে উঠলো। আবার চাকরী গেল। বারবার দুখিনী মা ও বয়স্থা বোনের ম্লান মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কোন্ মুখে চাকরী খুইয়ে মায়ের কাছে গিয়ে মুখ দেখাবে।

তার মনের অবস্থা বুঝে তহ্শীলদারবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন—বুঝতে পারছি, খুব দুঃখকষ্টে পড়বে। ভয় কী! সামনে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো বাপু, তবু নিজের কাছে ছোটো হয়ে যেয়ো না। ভগবান মঙ্গল করবেন। এ পথ তোমার নয়।

বর্তমানের গাঢ় অন্ধকারের গায়ে আঘাত লেগে যার চোখের আলো ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, ভবিষ্যতের রঙীন আলোর ধ্যান কেমন করে সে করে। তহশীলদারবাবুর ভাবগর্ভ উপদেশের বাণী তাই যতীনের মনে সাড়া জাগাতে পারলো না।

যাবার দিন ঘনিয়ে এলো।

সেদিন ভোরবেলা থেকে টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। যতীন বিছানা-পত্তর বাঁধতে স্থুরু করেছে। এমন সময় মাষ্টার-মশায় বলতে বলতে এলেন---ঐ দেখুন যতীনবাবু, আপনার বিদায়-বেদনায় নারায়ণপুরের আকাশ অশ্রুবর্ষণ করছে।

তারপর মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে যতীনের কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হলো। এদিকে ইস্কুলের বেলা হয়ে উঠেছিল। মাষ্টারমশায় বেশী দেরী করতে পারলেন না। যাবার সময় বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন –মনে পড়ে ?--

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।

নিঃশব্দ হাসির মধ্য দিয়ে দু'বন্ধুর বিদায়ের পালা শেষ হলো। যতীন তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিল। বর্ষাকাল: নদীতে নৌকা চলাচলের পথ হয়েছে। খালের জল উপচে সারা মাঠ ভেসে গেছে। সেখান থেকে খানিক দূর নদীপথে এসে আড়াআড়ি খাল দিয়ে মাঠে পড়তে পারলে সন্ধ্যার আগেই ঝিনেদা পর্যন্ত আসা যায়। তারপর মোটরে মাইল দশেক এলে তবে তার বাড়ী।

মাঝিরা এসে হাঁক ছাড়লো –বাবু, এখুনি উঠুন, নইলে সন্ধ্যার আগে ঝিনেদায় পৌঁছুনো যাবে না। যতীন তহশীলদার-বাবুকে প্রণাম করে কাছারীর পেয়াদার কাছে বাক্স-বিছানা

দিয়ে ছাতা হাতে করে বিষণ্ণ মনে ঘাটের দিকে রওনা হলো।

বর্ষাকালে আজ যে পথে চলতে গেলে কাদা ছিটকে গায়ে লাগে, সামনে নদীর ঊর্মিমুখর জল ওপারের দৃষ্টি ব্যহত করে আনে, বর্ষার আগে সে পথ এমনটি ছিল না। ধূসর ধূলির পথ তখন ইসারায় তাকে অজানার পানে ডেকে নিয়ে যেত। কতদিন এ পথে চলেছে ; চলতে চলতে আনন্দে ভরা প্রাণ তার ফেটে ফেটে পথের ধূলির উপর ছড়িয়ে গেছে।

মালপত্তর নৌকোয় তোলা হয়ে গেলে যতীন উঠে বসলো। নৌকোর চারদিক দিয়ে কলকল স্বরে ডেকে জল সামনে চলেছে ; ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে তীরে। দূ—রে মাছধরা দু'একখানা জেলের ডিঙ্গি নৌকো কাপড়ের পাল তুলে যাচ্ছে। তীরভূমিতে চাষীরা বড়ো বড়ো ধানবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান গাইতে গাইতে জমির নিড়ানি দিচ্ছে।

—এবার নৌকো ছাড়ি বাবু? মাঝিরা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো।

অন্যমনস্ক হয়ে যতীন জবাব দিল—হুঁ। বেদনাঘন দু'চোখ থেকে তার দু'ফোঁটা জল পড়ে নদীর চলমান জলস্রোতে মিশে গেল।

নৌকাখানি তীর ছেড়ে স্রোতের উপর এসেছে। এমন সময় যতীন চেয়ে দেখলো কলসী কাঁখে একটি স্ত্রীলোক ঘাটের দিকে আসছে। একটু পরেই তাকে চিনে ফেললো। ও যে

আহুরী ! যতীনের নৌকো তখন ভাঁটি জলে চলতে সুরু করেছে ; সামনেই বাঁক।

আহুরীকে দেখেই যতীনের মন চাঞ্চল্যে ভরে উঠলো। ছইয়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে সে বাইরে এসে বসলো। আহুরী তখন নদীর পাড়ে এসে পড়েছে। পাড় থেকে জলের কিনার পর্যন্ত ঢালু। আহুরী নৌকোর দিকে তাকায় আর নদীর মধ্যে নামতে থাকে। এইভাবে জলে নেমে কলসী ভরে নদীর পারে দাঁড়িয়ে সে নৌকোর পানে চেয়ে রইলো।

এদিকে নৌকা বাঁকের কাছে এসে পড়লো। যতীন আনমনা হয়ে একটু নড়ে বসতেই ছলাৎ করে নৌকোর মধ্যে খানিকটা জল উঠে পড়লো।

হালের মাঝি বলে উঠলো—সাবধান বাবু, এখানে বড় পাঁক। নড়াচড়া করবেন না।

যতীন পিছন ফিরে বাঁকের দিকে চেয়ে সাবধান হয়ে বসলো। তারপর সামনের দিকে চাইতেই দেখলো আহুরীর কাঁখালি থেকে জল-ভরা কলসীটি পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আহুরী স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই নৌকাখানি জলের আঘাতে বাঁকের মোড় ফিরে গেল।

# ধ্যানভঙ্গ

—আজ কী খেতে দিবি মা ?

—কলাভাতে, পুঁইশাক চচ্চড়ি, মটরের ডাল আর বড়ি ভাজা ;—তরুণী কণ্ঠে উত্তর এলো।

—হুঁ, আয়োজন যে অনেক করে ফেলেছিস্।

—ঠাট্টা করছো বুঝি বাবা ?

—না, না, ঠাট্টা করবো কেন রে ? ভাতের সঙ্গে চারটি সহভোজ্যের আয়োজন, এ ক'জনের কপালে জোটে বল্ ?---

—মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে প্রৌঢ় বাবার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে ; সে চাঞ্চল্য ভাষা পায় ছলছল চোখের চাহনির মধ্যে। মেয়ে তা' লক্ষ্য করে।

—বাবা, তুমি আজকাল সবার কাছে কেবল হেঁয়ালী হয়ে উঠছো, সহজ ভাষায় কথা বল্‌লেও তা' বুঝা কঠিন হয়ে ওঠে।

মেয়ের প্রশ্নাঘাতে বাবার মনের বেসুর তারগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর কম্প্র হয়, তিনি বলেন—যে অনেক কিছু ভাবে, কিছুই করতে পারে না, অনেক কিছু চায় কিছুই পায় না, তার হেঁয়ালী না হয়ে উপায় কী !

মেয়ে এসব ঘোরালো কথার মর্ম বুঝতে পারে না।

আলাপনের প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে আব্দারের সুরে বলে—বাবা, বাবা, তোমায় আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার কাছে যে ঋষিদের গল্প শুনেছি—ঠিক সেই ঋষির মতন। কাঁচাপাকা চুল, টানাটানা বড়ো বড়ো চোখ আলোয় উজ্জ্বল, রাঙা মুখখানি কাঁচাপাকা দাড়িতে ভরা। দাঁড়াও বাবা, তোমায় একটি প্রণাম করবো।

অবসর না দিয়ে ঢিপ করে মেয়ে বাবার পায়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো মাথায় দেয়। বাবার স্থির আঁখিকোণে বিন্দু বিন্দু জল জমে ওঠে।

কথার সুর পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হয়ে বাবা বলেন – আচ্ছা বল্‌তো, আমি তোকে ভালোবাসি কি না?

এ ধরণের প্রশ্নে মেয়ের মন অভিমানে ভরে যায়। কৃত্রিম ক্রোধে সে বলে ওঠে—না, মোটেই না।

—এই তো তুই ঠিক ধ'রেছিস না। আনন্দ-বেদনা-দোলা কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়, তিনি বল্‌তে থাকেন—সত্যি কথা বলেছিস মণি। জীবনে আমি কাউকেই ভালোবাসতে পারিনি, তোকেও না। তবে প্রয়োজনের তাগিদে ভালোবাসার ছল করতে হয়েছে অনেকবার।

মেয়ে বাবার উত্তেজনাময় উক্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে বলে—থাক্ বাবা ওসব; আমি যাই, আমায় রান্নাবান্না করতে হবে।

—যাস্‌নে শোন্; তোর বাবাকে তুই অন্ধের মতো ভালোবেসেই গেলি, তার স্বরূপ চিন্‌লিনে।

—চিনেছি, খুব চিনেছি ;—মেয়ের কথায় থাকে রাগের ঝাঁজ।

—ভেবেছিলাম চিনেছিস্ ; কিন্তু এখন দেখছি চিনিস্‌নি। জীবনে আমি কাউকেই স্নেহ দিইনি, ভালোবাসিনি। নিজের জীবনকেই ভালোবাসতে পারিনি, অপরকে কেমন করে বাসবো ! মানুষের জীবনটাকে আমার একঘেয়ে ব্যঙ্গের মতো মনে হয়েছে। তাই লোকে যখন বলে—'কী সুন্দর এই সংসার, ধন্য এই মানবজন্ম' তখন আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনে। —বলতে বলতে বাবা সজোরে হেসে ওঠেন। চোখে মুখে তাঁর কঠোরতার বিদ্যুৎ খেলে যায়।

মেয়ের তা' লক্ষ্য এড়ায় না, শিউরে উঠে সে বলে—আর ও সব কথা বলো না বাবা ; তোমার অমন চেহারা দেখলে ভয় করে আমার।

সেই কঠোরতার উপর একটু সজোর হাসি টেনে এনে বাবা বল্‌তে থাকেন, তখনও তাঁর আবেগ রুদ্ধ হয় না।

– না, না, ভয় করলে চলবে না। এই ভয়ই মানুষের সর্বনাশা। বাবা বলে যান—এই ভয়কে মানুষের আগে টুঁটি চেপে মারতে হবে। লোকে ভগবান পাবার জন্যে সাধনা করে, কী তাদের সাধনা জানিনে। তবে আমি বুঝি ভয়-ত্যাগের সাধনার দ্বারাই মানুষ সেই ভগবানকে পাবার অধিকারী হতে পারে।

মেয়ে কী যেন বলবার জন্যে উদ্যত হয় কিন্তু বাবার ভাব-

গম্ভীর ভাষণের চাপে তার কণ্ঠ মূক হয়ে আসে। বাবা বলে যেতে থাকেন—সে অনেকদিন আগেকার কথা, তখন তোরা এ পৃথিবীর কেউ ন'স্। সেদিন কে যেন কানে কানে বলে গেল, সবচেয়ে ভয় হচ্ছে অপরের শাসন মেনে চলার ভয়। সবার চোখরাঙানী মেনে-চলা যে জীবন, সে জীবন বড়ো বিড়ম্বনাময়। তাই সেদিন তরল রক্তে প্রলয়ের রাগিণী বেজে উঠেছিল। বেঁচে-থাকার মতো বাঁচতে না পারলে সে বাঁচার কোন দাম নেই; এই ভেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক সোজা করে জগতে নেমে পড়লাম। সবাইকে আমার বেদনা বুঝাতে চাইলাম। কেউ শুনলো, কেউ শুনলো না; কেউ সাড়া দিয়ে পালিয়ে গেল, কেউ সাড়া দিলো না। শুধু জীবনে ক্ষতবিক্ষত হলাম। যা' চাইলাম পেলাম না, যা' ছিল তাও হারিয়ে গেল। তাই তোর আজ এই দশা।

মেয়ে বাবার কথার মর্ম বোঝে না। বাবাও তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে চান্‌না। এমনিভাবে অন্তরের অতি কাছাকাছি এসেও বাবা মেয়ের কাছে হেঁয়ালী থেকে যান। মেয়ে বাবার পাগলামীর প্রশ্রয় না দিয়ে বলে—তোমার আজকাল আবার অম্বলের অসুখ বেড়েছে। আমি যাই, সকাল সকাল রান্নাবান্না সেরে তোমার খাবার ব্যবস্থা করিগে। এই বলে মেয়ে চলে যায়।

সারাদিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যাবেলা সকাল সকাল খাওয়া-

দাওয়া সেরে মেয়ে বাবার কাছে এসে বসে। ছোট একখানা সতরঞ্চির উপর একটি ময়লা বালিশে ভর দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বাবা একখানি 'গীতা' খুলে মনে মনে পড়েন। মেয়ে পাশে বসে বাবার মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, কখনো বা পা'দুখানি টেপে।

সহসা উত্তেজিত হয়ে বাবা মন্দ্রস্বরে আবৃত্তি করেন—

'পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

মেয়ের অর্থবোধ হয় না, অবাক হয়ে বাবার মুখের পানে চেয়ে থাকে। তিনি বুঝাতে চেষ্টা করেন—বুঝলিনে, শ্রীভগবান নিজে বলেছেন—অন্যায়ের অত্যাচারে পৃথিবীর মানুষ যবে জর্জরিত হয়ে উঠ্‌বে, অধর্মের কাছে ধর্ম হবে লাঞ্ছিত, তখন দুষ্কৃতদের নাশ করে সাধুজনের ত্রাণ এবং ধর্মস্থাপনের জন্যে আমি আস্‌বো পৃথিবীতে ধূলিমাটির মানুষ হয়ে।

—কতদিনে তিনি আসবেন বাবা ?—মেয়ে প্রশ্ন করে !

মেয়ের অন্তরের সাড়া পেয়ে তিনি বলেন—আগে তাঁর আসবার জন্যে আসন তৈরী কর্‌তে হবে তো ! কিন্তু আমাদের দিয়ে আর কিছু হবে না। আমরা শুধু জীবনপণ সহনশীলতা দিয়ে পথ এঁকে রেখে গেলাম সেই মহামানবের আবির্ভাবের জন্যে।

স্বর তাঁর মন্থর হয়ে আসে তবু সে উচ্ছ্বাসের গতি রুদ্ধ হয় না—জানিস্ মা, আমি গীতাখানি নিয়ে যখন বসি আমার চোখের

সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ভেসে ওঠে শ্রীকৃষ্ণরূপী সেই অনাগত পুরুষোত্তমের অভয় মূর্তি।

মেয়ের চোখ থেকে বিস্ময়-বিহ্বলতা উঁকি দেয়। বাবা তাঁর হৃদয়ের ভাবকে বাইরে রূপায়িত করবার প্রয়াসে বলেন—কতদিন বাঁচবো আর ; আমি ঠিক করেছি তোর একটি বিয়ে দেবো। তুই কায়মনোবাক্যে তাঁকে কামনা করবি ; তোর কামনা আর আমার ইচ্ছাশক্তির টানে তিনি তোরই কোল আলো করে আসবেন।

মেয়ের মুখে লজ্জার রক্তিমাভা দেখা দেয়। সে বলে—ওকথা এখন থাক্ বাবা।

বাবা তার সঙ্কোচ-ভাব লক্ষ্য করে বলেন—না, না, এতে লজ্জার কিছু নেই ; ভগবান নির্বিকার, নিরহঙ্কার। তিনি আসবেন সাধারণের ঘরে অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে। তাঁর কাছে জাতি নেই, ছোটবড়ো নেই। অকপট আকুতি নিয়ে যে তাঁকে আবাহন করবে, জাতিধর্মের নির্বিচারে তিনি সেই ঘরের শিশু হয়ে আস্‌বেন।

—বাবা, রাত অনেক হয়ে এলো, শোবে চলো। তোমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

—না, না, ঘুম আমায় অনেকদিন থেকেই ছেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে তন্দ্রায় চোখ ঢুলে আসে। স্বপ্ন দেখে আনন্দে তন্দ্রা ভেঙে যায়। হ্যাঁ যা বলছিলাম—তিনি আসবেন সারা ভারতের মুক্তির মাঙ্গল্যের ডালি হাতে। আমি হয়তো এ জন্মে দেখে

যেতে পারবো না। তবে আমি তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে আবার জন্ম নেবো এই পুণ্য ভারতভূমিতে, দরিদ্রের নয়নমণি হয়ে।

মেয়ে জানে তার সম্বন্ধে বাবার দুর্বলতা। তাঁর ভাবাবেগ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবে নিরস্ত করা প্রয়োজন; তাই মারণাস্ত্র হেনে ব'লে ওঠে---বাবা, আমার শরীরটা খারাপ লাগছে, আর বসতে পারছিনে।

—আচ্ছা, চল্ চল্ শুবি; বুড়ো বাবার কাছে থেকে তোর যে কী কষ্ট হয় আমি বুঝি। কী করবো, সাধ্য নেই তা মোচন করবার। তাকে ক্ষমা করিস্ মা।

অগ্রাণের মাঝামাঝি। ভরা শীতকাল না হলেও এ সময়ে মাঝরাত্রির আবহাওয়ায় আসন্ন শীতকালের করুণ আভাস পাওয়া যায়। মুরলীধরবাবুর অনেকদিনের অভ্যাস ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে নির্জনে বসে ইষ্টনাম জপ করা।

সেদিন শেষরাত্রি; মুরলীবাবু শয্যা ছেড়ে বাইরে এলেন মুখ ধোবার জন্যে। গায়ে একখানি কম্বল জড়ানো। মাটির একটি জালা থেকে ঘটি ভরে জল নিয়ে চোখেমুখে দিলেন। সোজা হয়ে দাঁড়তেই তাঁর অচঞ্চল চাহনি গেল গ্রহনক্ষত্র-শোভামান নীল নভোপটে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ হেলে পড়েছে বনরাজিনীল পশ্চিম দিগন্তে। পূর্বাচলে শুকতারার চোখে নতুন দিনের আগমনীর আভাস। মুরলীবাবু অবাক

চোখে সেদিকে চেয়ে দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন। তার নাভিমূল থেকে স্পন্দিত হয়ে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরকম্।'

ঘরে এসে প্রদীপ জ্বেলে তাঁর যোগাসনখানি খুঁজতে লাগলেন। এই যোগাসন বাঘছালের। যৌবনে তিনি হিংস্র-জন্তু শিকার প্রিয় ছিলেন। এটি তাঁরই নিজের হাতে মারা একটি বাঘছালে তৈরী।

একহাতে যোগাসন অপরহাতে প্রদীপ নিয়ে তিনি অভ্যস্থ স্থানের দিকে চললেন। একখানি মাত্র জীর্ণ আটচালা ঘর। সেই ঘরেই তিনি ও মেয়ে দু'জনে থাকেন। ঘরের পূবদিকের জানালার সামনে তাঁর অভ্যস্ত স্থান।

মণির শিয়র দিয়ে যেতেই তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন। গলা পর্যন্ত একখানি পাতলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে মণি ঘুমিয়ে আছে। তার মুখের পানে চাইতেই মুরলীবাবু চমকে উঠলেন। সারা দেহ অস্পষ্ট ভাবের শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

মিটিমিটি প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মণির মুখখানি। তার লাবণ্য-ঢলঢল উজ্জ্বল মুখমুকুরে বহুদিনের ভুলে-যাওয়া এমনিতরো একখানি মুখশ্রীর ছায়া। মণি দেখতে অবিকল তার মায়ের মতো। মুরলীবাবুর হাত থেকে প্রদীপটি পড়ে নিভে গেল।

অনেকদিন আগেকার কথা। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের ফলে তিনি রাজরোষ কবলিত হন। বিচারে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। যখন জেলে যান তখন মণি তার মায়ের গর্ভে এসেছে।

মণির মায়ের একমাত্র ভাই সে খবর পেয়ে বোনকে বাড়ীতে নিয়ে যান।

মণি গণ্ডে পা দিয়ে এসেছিলো ; তার জন্মের পর প্রসূতির হয় মৃত্যু। মুরলীবাবু তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হয়েছেন। মণির মামা এ সংবাদ মুরলীবাবুর ঠিকানায় পাঠান। 'সেন্সারড্' হয়ে তার হাতে চিঠি পৌঁছতে প্রায় দিন পনের লাগে। আনন্দের প্রলেপ-দেওয়া বেদনাবহ পত্রখানি পড়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেছিলেন —সে আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল তবু আমাকেও একেবারে নিঃস্ব করে যায়নি।

বিস্মৃত স্মৃতিকে মন থেকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে মুরলীবাবু আবার প্রদীপটি জ্বেলে যথাস্থানে গেলেন। আসনখানি পেতে পূবমুখো হয়ে বসে ইষ্টদেবের মূর্তি মনে এনে তিনি ধ্যানস্থ হলেন।

বেশীক্ষণ যেতে না যেতেই ইষ্টদেবের মূর্তি ধ্যান-চক্ষুর সামনে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ভেসে উঠলো প্রিয়ারূপিণী নারীমূর্তি। ক্রমপ্রকাশমান মাতৃত্বের মাঙ্গল্য-মোহিনী নারীমূর্তি। মণির মায়ের ছবি। শ্রেয় ও প্রেয়ের এই অভেদ দর্শন,—এ মুহূর্ত জীবনে খুব কম আসে।

চৈতন্য ফিরে আসতেই নিজের উপর তাঁর বিরক্তি এলো ; *ধ্যান-ভাঙা চোখ দু'টি জল-ছলছল হয়ে উঠলো। ইষ্টনাম জপে* আর কোনোদিন এমন বিঘ্ন তো ঘটেনি। তবে আজ কেন এমন হলো। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়েছে ভেবে বাইরে গিয়ে চোখে মুখে মাথায় জল দিয়ে আবার বসলেন ধ্যানে। এবারেও সেই একই বিঘ্ন। দেবতার ঠাঁই প্রিয়া এসে দখল করে নিল। সেদিনকার মতো ধ্যানভঙ্গ হলো।

এদিকে বাইরে ফর্সা হয়ে এসেছে। মুরলীবাবু জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন কয়েকজন লোক লাঠি-হাতে কী বলাবলি করছে।

দরজা খুলে বাইরে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ও কারা ওখানে ?

একজন হিন্দুস্থানী পুলিশ এগিয়ে এসে বললো—ক্যা আপ্ মুরলীধর ?

চোপ্ বেকুপ ; বোলো মুরলীধরবাবু।

দৃঢ়কণ্ঠ সৌম্যদর্শন ব্যক্তির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে মাথা নীচু করলো। একজন বাঙ্গালী পুলিশ এসে নমস্কার জানিয়ে বললো—আজ্ঞে আপনার নামে একখানা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

তখন বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা। ভারতবর্ষেও তার ঢেউ লেগেছে। বর্মা জাপানের করকবলিত। কলকাতায় বোমা পড়েছে। শাসক কর্তৃপক্ষ পুরাতন দেশসেবীদের সন্দেহ

করে গ্রেপ্তার করে কারাবন্দী কর্ছেন—পাছে তারা কেউ শত্রুর সহচর হয়ে পড়েন।

পরোয়ানাখানি হাতে করে মুরলীবাবু বললেন—আরে স্থধীর যে। এসো, বোসো। তা তুমি আগে না এসে ঐ বেকুপটাকে পাঠালে কেন বলো তো? ওরে মণি, স্থধীর এসেছে।

মুরলীবাবু যখন ইস্কুলমাষ্টার ছিলেন, স্থধীর ছিল সেই ইস্কুলের দপ্তরী। ইস্কুলের কাজে অনেকদিন সে এসেছে এ বাড়ীতে; মণি তখন ছোট ছিল, তাকে স্থধীরদা বলে ডাকতো।

সামান্য বেতনে পরিবার প্রতিপালন না হাওয়ায় ইস্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্থধীর পানবিড়ির দোকান দেয় স্থানীয় বাজারে। পরে যুদ্ধের প্রয়োজনে যখন অনেক লোক নেওয়া হয়, তখন স্বাস্থ্যের স্থপারিশে সে পুলিশে ঢোকে।

বাঙ্গালী পুলিশ স্থধীর আমতা আমতা করে বললো—আজ্ঞে, মেজোবাবু সঙ্গে আছেন; তিনি ললিতবাবুদের বাড়ীর ওখানে আছেন। আপনাকে শীগ্গীর নিয়ে যাবার কথা।

মুরলীবাবু হেসে বললেন - ও ললিতেরও বুঝি ডাক পড়েছে? একটু দাঁড়াও বাবা, আমি মণিকে বলে আসি।

ঘরে উঠতে উঠতে মণিকে ডেকে বললেন - ওরে মণি, আজ ভোরে আমার বাড়ীতে রাজদূত এসেছে। আমার বড়ো শুভদিন। আমাকে এখনি যেতে হবে।

ঘুম-ভাঙা চোখে মণি উঠে এলো। ব্যাপারটা সে ভালো করে বুঝতে না পেরে বললো—কী হয়েছে বাবা, তুমি অমন অস্থির হয়েছো কেন?

—রাজার ডাক; আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। ঐ ভ্যাখ রাজদূত দাঁড়িয়ে। তোর সুধীরদা রাজদূত হয়েছে যে।

বেশ তো, ওঁরা বসুন। তুমি হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে যাও।

—সে কি হয় মা? আমার যেতে দেরী হলে তোর সুধীরদাকে জবাবদিহি করতে হবে। ওর ক্ষতি হবে যে! আমার লাঠিখানা এনে দে মা।

মণি লাঠিখানা এনে দিল। বড়ো অনুগত সহচর এই লাঠিখানা। বহুদিন ধরে সম্পদে বিপদে সে সঙ্গ দিয়ে এসেছে। ওর বিরহ তিনি সইতে পারেন না।

যাবার বেলায় তিনি বলে গেলেন যে গিয়ে তিনি মণির মামার কাছে চিঠি দেবেন মণিকে তার কাছে নিয়ে রাখতে।

মণি তার বাবার ভাগ্য-বিপর্যয়ের ব্যাপারের সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত। সে পুলিস-বেষ্টিত বাবার গতিপথে চেয়ে রইলো। বার বার মনে হতে লাগলো সুধীরের কথা। সেই সুধীর, যাকে সে কতদিন নিজে হাতে খাইয়েছে। ক'দিন পুলিশে চাকরী নিয়ে এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছে সে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশক্রমে মুরলীবাবু নিরাপত্তা

রাজবন্দী হয়ে কিছুদিন যশোর জেলে থাকেন ; তারপর এইরূপ রাজবন্দীর সংখ্যাধিক্য হওয়ার তাদের কয়েকজনকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

যশোর জেল থেকে পত্রে মণির মামার কাছে সমস্ত জানিয়ে কোনো ফল হলো না। তিনি ছিলেন মুরলীবাবুর এসব কাজের ঘোর বিরোধী। তিনি বহুবার বলেছেন যে দেশসেবাটেবা ওসব বড়লোকের খামখেয়ালী কাজ। গরীবের ও 'ঘোড়াবাই' সাজে না। সে উপদেশ মুরলীবাবুর উপরে কার্যকরী না হওয়ায় তিনি শেষে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

মণির বাবা এককালে বেশ স্বচ্ছল ধানীপানী গেরস্ত ছিলেন। কিন্তু বৈষয়িক কূটবুদ্ধির অভাবে ও সরিকের ছলনায় সব গিয়ে এখন আছে শুধু একটি আমকাঁঠালের বাগিচা আর সামান্য কয়েক বিঘা ক্ষেতখামার।

ভাগারীরা চাষ-আবাদ করে ভাগের ভাগ যা স্বেচ্ছায় দিয়ে যায়, তাতেই বাপ-মেয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। নগদ আয়ের মধ্যে—আমকাঁঠাল বিক্রি করে যা হয়।

পৌষের মাঝামাঝি, আমন ধানের মরসুম। ভাগারীরা দেয় ধানের অংশ এনে উঠোনে ঢেলে দিয়ে যায়। মণি সারাদিন ধরে কুলো-ঝাড়া করে সেগুলি ঘরে তোলে। কাজের চাপে কোনোদিন দুপুরে খাওয়া হয়, কোনোদিন হয় না। সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধ্যাবেলায় ফেনা-ভাত রেঁধে খায়। তারপর দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে পড়ে।

বাবার কাছে কিছু বাংলা লেখাপড়া শিখেছিল; তা দিয়ে বাংলা বই পড়ে মোটামুটি ভাবগ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না।

গ্রামের নতুন পাস-করা ডাক্তার ফণীবাবু মুরলীবাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সমস্ত জানতে পেরে 'কলে' যাতায়াতের পথে দৈনিক দু'একবার এসে মণির সুবিধা-অসুবিধা জেনে যেতেন। বাজার থেকে কোনো জিনিসপত্র আনবার দরকার হলে বাড়ীর লোক দিয়ে আনিয়ে দিতেন।

পাড়াগাঁ; গ্রাম্যজীবন এবং শহুরে জীবনের তত্ত্ব নিয়ে শহরে বসে যাঁরা প্রবন্ধ লিখে হাততালি পান, তাঁরা অনেকেই এই অর্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অজ্ঞ। কালেকস্মিন্ গাঁয়ে এলেও আভিজাত্যের ঝাঁজে গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে মেশামেশি হয় না।

পাড়াগাঁয়ের চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে তার রাজনীতি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে যাঁরা স্বনামখ্যাত, তাঁরাও পাকা গ্রাম্য রাজনীতিবিদ্দের বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন কিনা সন্দেহ। অথচ এঁদের অধিকাংশের দৈনন্দিন জ্ঞানচর্চার বিষয়বস্তু হচ্ছে পরের মুখে শোনা খবরের কাগজের খবর আর অমুকের দিনকাল কেমন যাচ্ছে—এই।

মণিদের গ্রামের নাম তৈলকূপী; মহকুমা শহর ঝিনেদা থেকে মাইল নয়েক দূরে। একদিন এই গ্রাম ধনে-জনে-শস্যে সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিল। আজ সে জনহীন ধনহীন শ্মশান

সমতুল্য ; বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। যেখানে একদিন সভ্য মানুষের সুখাবাস ছিল, সেখানে আজ হিংস্র বন্যপ্রাণীর রাজদরবার। প্রকৃতি পরিশোধ নিয়েছে। কালের বিপুল রথচক্রপেষণে মানুষের বিরাট সৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

তৈলকূপী গাঁয়ের প্রধান হচ্ছেন জয়গোপালবাবু। বয়সে বুদ্ধিতে প্রবীণ, রসে ও রভসে নবীন। নিজের জমাজমি নিয়ে বহু মামলা করেছেন ; জিতেছেন, হেরেছেনও। পরস্পর দু'পক্ষে কানভাঙচি দিয়ে মোকদ্দমা বাধিয়ে যে পক্ষ জয়ী হবে সেই পক্ষকে আইনের পরামর্শ দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। সর্বোপরি তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। গাঁয়ের লোকে তাঁকে ভক্তির চেয়ে ভয় করে বেশী। দায়ে পড়লে অনেক নিরীহ প্রতিবেশী প্রণামী দিয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে আসে। প্রণামীর তারতম্য অনুসারে উপদেশ দিয়ে পাকা গোঁফের ফাঁকে চোরাহাসি হেসে বলেন—বাবাজী, সংসারী হলে না তো, তা আর বুদ্ধি পাকবে কী করে! ছ্যাখো, সংসারধর্ম্ম করতে করতে আমার চুল সাদা হয়ে গেল তবু আমি-ই বা কতটুকু বিষয়বুদ্ধি রাখি।

সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে মণি ঘরে গেছে এমন সময় এজের মণ্ডল তার ভাগের ধান ঢেলে দিয়ে গেল। বিশ্রাম করা হলোনা ; মণি কুলো নিয়ে ধান ঝাড়তে বসলো।

ফণী ডাক্তার 'কল' থেকে ফিরে যাবার পথে ওদের বাড়ীতে

এসে কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে পড়লেন, এমন সময় জয়গোপালবাবু হুঁকো হাতে করে গলায় খ্যাঁকর দিতে দিতে এগিয়ে এসে বললেন--বলি, কেমন আছ নাতনী।

গ্রাম সম্পর্কে মুরলীবাবু এঁকে খুড়োমশায় বলে ডাকতেন সেই সূত্রে মণি ডাকে দাদু বলে।

আচমকা মণি চেয়ে দেখলো জয়গোপালবাবু। কোনোদিনই তিনি তাঁদের খোঁজ খবর নেন না। অথচ আজ দরদীকণ্ঠে কুশলপ্রশ্ন শুনে তার বিস্ময় হলো।

ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর ছড়িয়ে হেসে বললো ভালো আছি দাদু।

-- ফণী এসেছিলো বুঝি? ওকি আমায় দেখে চলে গেল?

- না দাদু; কাকাবাবু 'কল' থেকে ফিরবার সময় বা 'কলে' যাবার সময় আমার খোঁজখবর নিয়ে যান।

-তা তো যাবেই। কার মেয়ে তুমি? মুরলীর মতো ছেলে এমন দশখানা ইউনিয়নের মাঝে নেই।

বাবার প্রশংসায় মণি চুপ করে রইলো। জয়গোপালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ভাগারীরা ধান দিয়ে গেছে বুঝি? তা মেপে-টেপে নিয়েছো তো?

ধান ঝাড়তে ঝাড়তে মণি বললো—ওরা মেপেই দিয়ে গেছে।

– তোমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাতে পারে তো?

সরলপ্রাণা সে ; বুঝতে পারে না—কাউকে না ঠকালে কেউ কাউকে ঠকাতে পারে। একটু হেসে সে বললো—আমরা ওদের ঠকাইনি তো দাদু। তা ছাড়া বাবাও কোনোদিন নিজে মেপে নেননি।

—তা বেশ ; ধান রাখছ কোথায়, ঐ ভাঙা ঘরে বুঝি? যুদ্ধের জন্যে ধানের দাম যা বেড়ে উঠছে ; তারপর এ দিকের লোকের ভাবগতিক তো জানোনা। আমার ভয় হয় চোরের নজর-টজর না পড়ে। তুমি বয়স্থা মেয়ে, ভগবান না করুন, একটা চেঁচামেচি হলেও তো লজ্জার কথা।

সত্যিই তো ঘর ভাঙা ; বাড়ীতে সে একা মেয়েমানুষ। চোর এলে সে কী করতে পারে ! অথচ এই-ই হচ্ছে তাদের সারা বছরের সম্বল। মনে তার কাল্পনিক ভয়ের সঞ্চার হলো। ভীত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলো -- তাহলে কী করবো দাদু ?

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ মণির সামনে হাত পাঁচেক দূরে গিয়ে বসলেন।

—ওকি, আপনি মাটিতে বসলেন যে দাদু ? আমি আসন এনে দিচ্ছি।

—আরে নাতনী, হয়েছে। এ তো আমার নিজের বাড়ী। তার চেয়ে তুমি আমায় একটু আগুন এনে দাও।

কলকেটি নিয়ে রান্নাঘর থেকে আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে সে বেরিয়ে এলো। ঘুমন্ত আগুনের শিখায় তার তরুণ মুখখানি অপরূপ আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

বৃদ্ধ কলকেটি নিতে নিতে বললেন—আহা! নাতনী এই খাটুনী খেটে খেটে তোমার পাকা ডালিমের মতো মুখখানি কেমন শুকিয়ে উঠেছে ত্থাখো তো।

বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষুগহ্বর থেকে একটি হিংস্র চাহনি বেরিয়ে এলো। অদন্তক মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে বললেন—নাতনী আমার লজ্জা পেয়েছে দেখি। আয়নায় তো একবার মুখখানা দেখলে না।

মণিকে নিরুত্তর দেখে তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন,—যাক্ যা বলছিলাম। তোমার বাবা বাড়ীতে নেই। সে যা হোক আমাকে খুড়ো বলে শ্রদ্ধা করতো। তোমার অসুবিধে তো আমারই দেখা উচিত। নইলে ফিরে এসে আমায় মন্দ বললে আমি কী জবাব দেবো।

মণি ধান ঝাড়তে লাগলো। হুকোয় কয়েকটি সুখটান দিয়ে ধাতস্থ হয়ে জয়গোপালবাবু বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন—তা' তোমার অমত না হলে আমার পশ্চিমের ছোট গোলায় তোমার ধান রাখতে পারো। আর তোমার একটা পেট, ও যা চাল লাগে আমার বাড়ী থেকেই নিয়ে এসো। তোমার বাবা এলে তার সঙ্গে হিসেব-টিসেব হবে।

সেদিন বিকেলেই জয়গোপালবাবুর বাড়ীর চাকর এসে মণিদের সমস্ত ধান ওবাড়ীর গোলায় নিয়ে তুললো।

মণির দিন কেটে যেতে লাগলো। ঘরে তার বাবা-মায়ের একখানি যুগ্ম ছায়া-ছবি বাঁধানো ছিল। বাড়ীর সামনে তারই

হাতে লাগানো গাঁদাফুলের গাছ। শীতের আবির্ভাবে তাদের শাখায় শাখায় স্তবকে স্তবকে পুষ্প-সমারোহ। মণি গাঁদা ফুলের মালা গেঁথে সময় কাটায়। গাঁথা হলে বাবা-মায়ের ছায়া-ছবির পদপ্রান্তে গিয়ে সেই মালার সবেদন অর্ঘ্য নিবেদন করে। ছবির দিকে চাইতেই তার চোখ দু'টি অব্যক্ত বেদনায় সজল হয়ে ওঠে।

মাকে সে দেখেনি। পাড়ার লোকের মুখে শুনেছে তাঁর গুণবত্তার কাহিনী। দোহারা চেহারা, হাসির সারল্য মাখা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখখানি, অপলক চাহনিতে অলখ-স্রোতা করুণার ফল্গুধারার অভিব্যক্তি। মা যেন জীবন্ত দেবীমূর্তি। এমন মায়ের মেয়ে সে-- ভাবতেই আনন্দে তার অকলুষ অন্তর আলোড়িত হয়ে ওঠে। সে আনন্দবোধের কাছে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যহীন প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার স্মৃতি তুচ্ছতর হয়ে যায়।

ভোরে উঠে সেই যুগ্ম ছায়া-ছবির নীচে একটি বিনম্র প্রণাম রেখে ঘরদোর ও উঠোনে ছড়াঝাঁট দেয়, রান্নাঘর নিকোয়। দৈনিককার বরাদ্দ আধসের চাল ওবাড়ী থেকে নিয়ে আসে। গাঁয়ের পুরানো ঝি বলার মাকে দিয়ে হাট থেকে দু'চার পয়সার তরিতরকারি এনে রাখে। দুপুরবেলা খেতে বেলা গড়িয়ে যায়, রান্নার উদ্বৃত্ত অংশ কিছু রেখে দেয় রাতের জন্যে।

ফাল্গুনের শেষাশেষি। নামে বসন্তকাল, বাতাসে শীতের

আমেজ আছে। কবির বসন্ত বর্ণনার সঙ্গে বাংলায় বসন্তকালের বড়ো মিল নেই। বসন্তের বাস্তব রূপ এখানে ব্যাধির করালমূর্তি। তবু দু'একটা পথভোলা কোকিলের ডাক, আচমকা হাওয়া, মাঠ-ভরা ভাঁটিফুলের শ্বেতোচ্ছ্বাস, আমের বোলের গন্ধ, - এরই পিছনে বিশেষণ এবং সামনে আরোপণ জুড়ে বাঙ্গালী মনে মনে ঋতু-বিলাস করে।

সেদিন দুপুরে শুয়ে শুয়ে মণি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়ছিল। ব্যর্থযৌবনা রোহিণী পুকুরঘাটে চলেছে ; গাছে বসন্ত-কোকিল ডাকছে -কু-হু, কু-হু। রোহিণীর কাছে কোকিলের ডাক ব্যঙ্গের মতো মনে হচ্ছে। পড়তে পড়তে সে রোহিণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। বাইরে তখন একটা কোকিল মধ্যে মধ্যে ডেকে উঠছিল -কু-হু-কু-হু। সে জানে না যে সে-ও অতৃপ্ত-যৌবনা রোহিণীর মতো ভরা যৌবনের সিঁড়ি-বাঁধা ঘাটের পথে চলেছে। তবু বাইরে কোকিলের ডাক, মনে রোহিণীর স্মৃতি তাকে উন্মনা না করে ছাড়লো না।

পড়ে চলেছে সে, রোহিণীর চরম পরিণতি গোবিন্দলালের হাতে মরণ-বরণ। যে গোবিন্দলালের কাছে সে চেয়েছিল নব জীবনের অমৃতাস্বাদ, যে গোবিন্দলালকে রোহিণী তার যৌবনের মণিমন্দিরের স্বর্ণবেদীতে স্থাপিত করে দেবতাবোধে দীর্ঘদিন ধ'রে নিভৃত অশ্রুজলে পূজা করেছে, সেই দেবতার এমনিতরো বিচার-বিপর্যয়। মণির মধ্যেকার সুপ্ত রমণী বলে উঠ্লো - লেখকের এ ভারী অন্যায়। ভালোবেসে রোহিণী অপরাধিনী

হতে পারে না ; ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটিয়ে অপরাধী গোবিন্দলাল।

এমন সময় 'বলার মা' উঠোনে এসে ডেকে বললো—ও দিদিমণি, হ্যাদে ত্যাখো, তুমার একখানা চিঠি এয়েছে।

মণির চিন্তাজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বইখানা ধপ্ করে রেখে উঠে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে দেখলো—বাংলায় লেখা 'মা মণি', আর সব ইংরিজিতে লেখা। চিঠিখানার মুখ খুলে আবার জোড়া দেওয়া। উপরে একটি ইংরিজি সিল।

মণির বাবা চিঠি লিখেছেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে। 'সেনসারড্' সিল খেয়ে এসেছে।

বাবার চিঠিখানা পেয়ে সে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো। একবার, ত্ব'বার, তিনবার পড়লো- তবু সবটুকুর অর্থবোধ হলোনা।

'বলার মা' অবাক হয়ে চেয়ে বললো বলি কীডা চিঠি দেলো ? পড়তি পড়তি দিশেহারা হচ্ছো যে।

সরল হাসি হেসে সে জবাব দিল- এখানা বাবার চিঠি বলার মা।

–কী করছ নাতনী, দেখা নেই যে! শ্মশ্রুশোভন হাসি হেসে লাঠি-হাতে জয়গোপালবাবু মণিদের বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালেন।

সহসা জয়গোপালবাবুর আবির্ভাবে ঈষৎ ত্রস্ত হয়ে মণি বাবার চিঠিখানা বুকের কাপড়ের মধ্যে গোপন করতে গেল।

জয়গোপালবাবুর শ্যেনদৃষ্টিতে তা ধরা পড়লো। তিনি কৃত্রিম হাসি হেসে বললেন—দেখে ফেলেছি নাতনী, দেখে ফেলেছি; ও কার চিঠি লুকুচ্ছো?

সে ধীরে ধীরে জবাব দিল--বাবার চিঠি দাদু। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার ছলে বললো--বসবেন দাদু?

-না, না, বসবার দরকার নেই; দেখতে বুড়ো হলেও নাতনী, সোমত্ত একেবারে যায়নি। দরকার হলে এখনও তোমার মতো নাতনী নিয়ে ঘর করতে পারি।

--যান্ দাদু, অমন ঠাট্টা করতে আছে! মণি লজ্জায় বিরক্তিতে অস্বস্ত হয়ে উঠলো, অথচ কেমন করেই বা এই বৃদ্ধকে চলে যেতে বলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—দাদু, বাবা লিখেছেন

--হ্যাঁ হ্যাঁ, কী লিখেছে বলো তো? শীগ্গীর আস্‌বে না কি?

—না, সে কথা নয়। এই আমাকে সাবধানে থাকতে লিখেছেন, আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন-

কষ্ট-কল্পিত গর্বের হাসি মুখে এনে তিনি বললেন—করবে না? বলেছিনা মুরলীর মতো ছেলে এমন দশখানা ইউনিয়নের মাঝে নেই!

- আর আমাকে লিখেছেন যে রাতে একা থাকতে ভয় করলে 'বলার মা'কে রাখবার জন্যে। রাতে সে আমাদের বাড়ী খাবে আর মাইনে কিছু পাবে, বাবা এসে দেবেন।

—তা তো ভয় হবার-ই কথা ; যেমন লক্ষ্মীছাড়া গাঁ এ, শত্রুর অভাব নেই। তারপর নাতনী, তোমার কথা আলাদা, তোমার রূপযৌবনই যে তোমার শত্রু !

বৃদ্ধ রসিকতা করে হাসবার চেষ্টা করলেন, মণির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বৃদ্ধ অন্যভাবে কথার জের টেনে বলতে লাগলেন—কেন, ফণী আজকাল আসে না ? তাকে বললেও তো……

তাঁর সময় কোথায় ? 'কল' থেকে ফিরবার পথে আসেন একবার। তাঁর লোক খুঁজে দেবার সময় হবে না।

'বলার মা' এতক্ষণ কথাবার্তা শুনছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে মণি বললো—থাকবে তুমি বলার মা ? দাদু, বলে দিন না ওকে।

'বলার মা' পাকা ঝি। জয়গোপালবাবুর আলাপনের মর্ম গ্রহণ ক'রে তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করবার আশায় বললো - তা তুমার দরকার হলি তো বুড়ো কত্তাউ যখন তখন দ্যাখাশুনো কত্তি পারে।

'বলার মা' দেখলো জয়গোপালবাবু গোঁফে হাত বুলিয়ে চলেছেন আর মণি নিরুত্তর। তখন আগের কথার খেই টেনে ভিন্ন সুরে বললো তা আমার আর কী ! ন্যাড়াখ্যাড়া মুনিষ্যি আমি ; তুমার যদি ভালো হয়, আমি যেতে আসতি পারি।

'বলার মা'র থাকাটা বৃদ্ধের ইচ্ছানুরূপ না হলেও মণির সমর্থনে বললেন—তা বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমি উঠি নাতনী।

মুরলীবাবু নিরাপত্তা রাজবন্দী হয়ে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। যশোর জেল থেকে তাঁরা কয়েকজন এখানে স্থানান্তরিত হন। এখানে আরও কয়েকজন রাজবন্দীর সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক পরিচয় হলো।

বন্দী হলেও এঁদের জন্যে কারাভ্যন্তরে একাংশ নির্দিষ্ট আছে। সাধারণ অপরাধী বন্দীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ কম; এঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিধেয় বস্ত্রাদিও কর্তৃপক্ষ থেকে পান। ইংরিজি বাংলা সংবাদপত্র, কালিকলম, কাগজ সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। শুধু বাইরের জগতের গতির সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র ছিন্ন। কোনো প্রামাণ্য অপরাধে অপরাধী না হলেও শাসকতন্ত্র এঁদের বিপ্লবী শক্তিতে ভীত হয়ে বন্দী করে রেখেছেন।

বিভিন্ন জেলার নির্যাতিত দেশবাসীর একত্র সম্মেলনে কারাভ্যন্তরের একাংশ তীর্থে পরিণত হয়েছে। মনে পড়ে ইংরেজ কবির উক্তি

Stone walls do not a prison make,
Not iron bars a cage ;
Mind innocent and quiet
Take that for a hermitage.

যে কয়েকজন অ-পূর্বপরিচিত রাজবন্দীর সঙ্গে মুরলীবাবুর পরিচয় হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আলাপনের অন্তরঙ্গতায় সবচেয়ে আত্মীয় হয়ে উঠেছেন বয়ঃকনিষ্ঠ রাজবন্দী মানিকমোহন সেন।

বয়স সাতাশ আঠাশ, বাড়ী পাবনা জেলায়। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, বাড়ীতে বিধবা মা ও একটি ছোট ভাই। ভাইটি ইস্কুলে পড়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন আসন্ন; সারা জাগতিক রাজনৈতিক প্রকৃতির মুখে একটা ভয়াল স্তব্ধতা। যেন কোনো দুর্বার ঝঞ্ঝার আবেগে তার অন্তর কম্পমান। সেবার মাণিকমোহন সদ্য বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হৃষ্টমনা, পুষ্টতনু, আত্মবিশ্বাসী, স্পষ্টবাদী এই যুবকের সঙ্গে বহুদিন বহুবিষয়ে মুরলীবাবুর আলোচনা হয়।

আদর্শের মিল নেই। মুরলীবাবু গান্ধীপন্থী, মানিকমোহন সুভাষপন্থী। একজন অহিংস বিপ্লবের সমর্থক, একজন সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক। তবু দুইজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুক্তিকামী অকুণ্ঠ আলাপনের টানে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়েন। লক্ষ্য যেখানে এক, শক্তি যেখানে নির্ভীক, পথের স্বাতন্ত্র্য সেখানে যাত্রায় ক্ষণব্যবধান রচনা করলেও পথের শেষে মিলন অবশ্যম্ভাবী। এখানে আন্তর বিরোধের অবসর নেই। আপন অন্তরের উপলব্ধ সত্যকে শ্রদ্ধা করে যে না-পাওয়ার অভিসারে চলেছে সে অপরের অন্তরের সত্যকে হেয় ভাবতে পারে না। গতি যেখানে দুর্বল নীতির বিরোধ সেখানেই।

মুরলীবাবু অহিংসনীতির ব্যাখ্যা করেন, মানিকমোহন সশ্রদ্ধ অন্তরে তা শোনেন। মুরলীবাবু বোঝাতে চান যে বিক্রমশীল

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে খামখেয়ালী করে বিপ্লব ঘোষণা করে শুধু নিরীহের রক্তপাতে দেশের মাটি ভিজে উঠবে।

সে-কথা মেনে নিয়েই মানিকমোহন বলেন—জানি বিপ্লবে রক্ত আছে। আপনারা শুধু বাইরে থেকে কিছু রক্তপাতের ভয়ে চমকে উঠছেন কিন্তু তিল তিল করে ওরা আমাদের রক্ত শুষে যে প্রাণশক্তি ক্ষয় করে নিয়ে আসছে—সেটাও কি রক্তক্ষয় নয়? দুর্বলের মতো আমরা অন্তরের সে অপচয় সহ্য করবো তবু বাইরে থেকে সামান্য অপচয়ের ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করবো না।

—নিশ্চয়ই করবো কিন্তু অহিংস উপায়ে; বাহুবলের দ্বারা নয়, আত্মিক শক্তির সাহায্যে।

মানিকমোহন আবেগকম্পিত স্বরে বলেন- আমি মনে করি বাহুটাও দেহের অঙ্গ, আর আত্মাও দেহস্থ; তাই শক্তি, তা সে মনেরই হোক, আর আত্মারই হোক, তার উৎস ঐ স্থূল দেহের রক্তস্রোত থেকেই। দেহমুক্ত আত্মার অস্তিত্ববোধ আমার মাঝে নেই। আর উপায়ের কথা বলছেন? আমার ধারণা বিপ্লবে হিংসা অহিংসার প্রশ্ন নেই। ও দু'য়ের দ্বন্দ্ব ভাষাগত। বিপ্লব বলতে আমি ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচারও নয়, ইংরেজ জাতির ধ্বংস-প্রয়াসও বুঝিনা।

—কিন্তু ইংরেজ জাতির গায়ে আপনারা অস্ত্রাঘাত করবেন অথচ সেটা ঘৃণাও না, হিংসাও না?

—হ্যাঁ, তাই আমার ধারণা। এ বিশেষ কোনো জাতির

বিরুদ্ধে বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়। বিপ্লব বলতে আমি বুঝি নবতর সৃষ্টির আকুতি। অচল স্থিতির বিরুদ্ধে চঞ্চল গতির বিদ্রোহ। দেশের শাসনতন্ত্র যখন শোষণযন্ত্রে পর্যবসিত হয়, অধিকাংশের শোণিত-শোষণে স্বল্পাংশ স্ফীত হয়ে ওঠে, অধিকাংশের গ্লানির বাষ্পে ভূকম্পনের মতো প্রকৃতির নিয়মে বিপ্লব গড়ে ওঠে। তার গতি নিজস্ব। আকৃতি তার হিংস্র হলেও প্রকৃতি তার অহিংস থাকতে পারে। যে মুষ্টিমেয় স্বল্পাংশ যন্ত্রের মতো শাসনতন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধে। আমরা সেই অমঙ্গলের প্রতীকদের ধ্বংস করে নতুন মঙ্গলকর কিছু সৃষ্টি করতে চাই।

যুবকের দৃপ্তকণ্ঠের ভাষণ মুরলীবাবু নির্বাক হয়ে শোনেন। যুবকের হিংস্রমনোভাব মুরলীবাবুর অন্তরে সাড়া জাগায় না, তবু তার মুখর ভাষণ শুনতে মন্দ লাগে না। তিনি স্বভাব-গম্ভীর হাসি হেসে বলেন---আপনারা যুবক ; যৌবনের প্রকৃতিই যে ব্যয়শীল। তাই ধ্বংসকেই আপনারা সৃষ্টি মনে করেন। কিন্তু শুধু আপন জাতির কল্যাণের জন্যে অপর জাতির অকল্যাণের আয়োজন আমি সমর্থন করিনে। এ মনুষ্যত্বের কাছে মহা অপরাধ। ভারতবর্ষ এতবড়ো অপরাধ করতে পারে না।

—এ অপরজাতির অকল্যাণের আয়োজন নয়, নিজেদের জন্মগত অধিকার,- স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস! অপরের অকল্যাণের মনোগতভাব না নিয়েও যদি এতে কারো কিছু ক্ষতি হয়, তা হবেই। ভারতকে আগে স্বাধীন স্বত্বা নিয়ে বাঁচতে

শিখতে হবে, তবেই সে মনুষ্যত্বের জন্যে মরবার অধিকারী হতে পারে।

—এ আত্মকেন্দ্রিকতা, এ হীনমন্যতা ; এ ভারতের আত্মার কাছে অপরাধ।

—না, না, না। ধ্বংসমাত্রেই অপরাধ হতে পারে না। ন্যায়ের ধ্বংস যদি অপরাধ হয় তবে অন্যায়ের ধ্বংস না করাও অপরাধ। ভারতের মূর্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে কি বলেছেন? মূর্তিমান অন্যায় কুরুপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাবার জন্যে তিনি-ই না পাণ্ডবদের উত্তেজিত করে বলেছিলেন—'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ'?

মুরলীবাবু স্থিতধী : এতদিন অহিংস ও হিংস পন্থার মধ্যে একটি কাল্পনিক ব্যবধানের পারাবার রচনার করে একতীরে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করে এসেছেন। কিন্তু প্রাণবান যুবকের বলিষ্ঠ ভাষণের বন্যাস্রোতে যেন দু'তীর আজ ভেঙে একাকার হয়ে যেতে লাগলো। মুহূর্তের জন্যে তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন। প্রসঙ্গের মোড় ঘোরাবার উদ্দেশ্যে অন্যভাবে বললেন—কিন্তু অসহযোগের দ্বারাই তো বিনারক্তপাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

মাণিকমোহন অপেক্ষাকৃত: মৃদুস্বরে বললেন—অসহযোগের অস্ত্র শক্তিমান, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু সম্পূর্ণ অসহযোগ আমরা কার্যকরী করতে পারবো না। অসহযোগের কৃপাণ শাণিত করতে চাই মিলনের শাণযন্ত্রে। শক্তি যে শাসকের হাতে।

যখনই সে দেখবে আমরা মিলনের পথে পরস্পর হাত মিলিয়ে অগ্রসর হচ্ছি তখনই সে স্বার্থগন্ধী ভেদনীতির মুক্ত অস্ত্র নিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। তাতে বাঞ্ছিত কল্যাণের আবির্ভাব বিলম্বিত হবে বৈ নয়। ব্রিটিশ-অজগরের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিষে আজ হিন্দু-মুস্লিম মিলন-প্রয়াস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। অন্তরে মৈত্রীর মন্ত্র রেখে বাইরে শত্রুভাবে সাধনা করলে যদি আমাদের কল্যাণ ত্বরিত হয়, আমি বিশ্বাস করি—তাই মুক্তিকামী ভারতের অবলম্বন হওয়া উচিত।

যুবকের যুক্তির আঘাতে বৃদ্ধের চিন্তাজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; তবু তাঁর স্থৈর্যহানি ঘটে না। যুবকের প্রতি মুরলীবাবুর সশ্রদ্ধ স্নেহ সঞ্চার হয়। তিনি মনে আভাস পান যেন এই আপাতবিরোধী অহিংস ও হিংস মতেরও মঙ্গলময় পরিণয় অসম্ভব নয়। তিনি তো অস্তাচলগামী সূর্য; আসন্ন রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে তাঁর ক্রমক্ষীয়মান রশ্মিরেখা স্বপ্নে মিলিয়ে যাবে। রাত্রির তপস্যায় পূর্বাচলে যে নব রক্তরশ্মিরাগের অভ্যুদয় হবে সে রশ্মি বিকীরণের মালিক তো এই যুবকের দলই। যুবকের অকরুণ আঘাত তাঁর ছিন্নতন্ত্রী মনোবীণা ক্ষণতরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। তিনি আশা করেন—কারামুক্তির পর মণি-মাণিকের শুভ মিলনের দ্বারা তিনি সারা ভারতের সম্মুখে একটি কল্যাণময় মহান্ আদর্শ রেখে যাবেন।

'বলার মা' সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঝি-গিরি করে, সন্ধ্যায়

মণিদের বাড়ীতে আসে। সন্ধ্যা ঘোর হলে মণি সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। মণি নিজে আগে খায় না; বলার মাকে খাইয়ে যা' থাকে নিজে খায়।

'বলার মা' জাতিতে বাগ্দী; জলচল না হলেও একঘরে খেতে মণির বাধে না। অস্পৃশ্যতার বাদবিচার এ বাড়ীতে নেই। মুরলীবাবু আচারনিষ্ঠ হিন্দু হ'লেও কুসংস্কারমুক্ত। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা মণি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছে।

রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মণি কিছুক্ষণ বই পড়ে। কোনোদিন রামায়ণ, বাংলা গীতা বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। 'বলার মা' এ সব বোঝে না তবু নাছোড়বান্দা হয়ে মণির মুখ দিয়ে পড়িয়ে শোনে। সে অবাক হয়ে ভাবে—এতগুলি মানুষের মুখের কথা ঐ ছেঁড়া বইয়ের পাতায় কালোদাগের মধ্যে কেমন করে বন্দী হয়ে আছে। সে-ও মেয়েমানুষ, মণিও মেয়েমানুষ: অথচ তার কাছে যা' অসাধ্য, মণির কাছে তা কত সহজ। ভদ্দর লোকে আর ছোটলোকে কী আকাশ পাতাল প্রভেদ!

প্রতি বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার পর মণি লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে। 'বলার মা' শোনে আর ভাবাবেগে দেবীর উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম করে; বলে—আহা-হা দিদিমণি তুমার ঘরে লক্ষ্মীছিরি হোক্; শত্তুর মুখি ছাই দিয়ে তুমার বাড়-বাড়ন্ত হোক্।

সেদিন হাটবারে বিকেল বেলা 'বলার মা' হাটের পয়সা নিতে এলো। মণি পাঁচ আনার পয়সা দিয়ে তারই মধ্যে তরীতরকারী লবণ আনবার কথা বললো। 'বলার মা' আঁচলে গেরো দিতে

দিতে বল্‌লো—দিদিমণি, আমার জন্যি একটু আলা-তামুকির পাতা আন্‌তি দিবা না ? গুঁড়ো মুখি না দিলি আমার পেরাণডা আইঢাই করে। মণি একটু হেসে আর দু'টি পয়সা দিয়ে বিদায় দিল।

ঘরে মণির মায়ের একখানা পুরানো আয়না ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌বার আগে মণি তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে ঘরে এলো। আলগোছে বাঁধা চুলগুলি পিঠের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে মণি সেই আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো।

মণি নিজেকে দেখে নিজে চম্‌কে উঠলো। ভুলে গেল যে সে নারী। তার মনে হতে লাগলো সে যেন অজ্ঞাতকুলশীল রাজপুত্র, চলেছে কোন্‌ রূপকথার রাজকন্যার অভিসারে। চারিদিকে চেয়ে দেখলো কেউ তাকে দেখছে কিনা। আশ্বস্ত হয়ে বক্ষোবাস সুবিন্যস্ত করে মুখের উপরকার এলিয়ে-পড়া চুলগুলি সরিয়ে মুখখানি আর্সির কাছাকাছি নিয়ে গেল। নিজের এলো চুলের গন্ধে সে নিজে মোহিত হয়ে উঠলো।

'বলার মা' হাট সেরে এতক্ষণে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। মণিকে ঐ ভাবে দেখে সে একটু থম্‌কে বললো—ন্যাও দিদিমণি তুমার সদাই।

অন্যায় কাজ কর্‌বার সময় ধরা পড়লে অপরাধীর যে ত্বরিত ভাব-বিপর্যয় হয়, 'বলার মা'কে দেখে মণির ঠিক সেই অবস্থা হলো। 'বলার মা' নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছে। ত্রস্ত হরিণীর মতো

চুলগুলি হাতে জড়িয়ে ঝুঁটি বাঁধবার উদ্যোগ করে বলে উঠলো —রাখো 'বলার মা' আস্‌ছি আমি।

'বলার মা' বয়ঃজ্যেষ্ঠার মতো গম্ভীর স্বরে বল্‌লো—দিদিমণি, উডা ভালো না। সোমত্ত বয়সে খাঁটি সন্ধ্যে বেলা চুল খুলা ভালো না। বেম্ম দত্তিটত্তির ভয় কত্তি হয় তো।

মণি লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলো। 'বলার মা' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বল্‌লো—আজ হাটে দিদিমণি, মাছ বড্ডো সস্তা; ফট্‌কীর পুঁটি, ইঁয়া-ইঁয়া তেলাচো পুঁটি। তুমি এয়োস্ত্রীলোক, মাছটাছ না খালি গতর থাক্‌বি ক্যান্‌?

'বলার মা'র সাধুভাষায় দরদী সম্বোধনে মণি একটু হেসে বললো—কী করবো বলার মা, জানো তো বাবা বাড়ীতে নেই অত পয়সা কোথায় পাবো?

মণির ঘরোয়া দুঃখের কথায় 'বলার মা'র মন দরদে ভরে গেল। সমস্যার সহজ সমাধানের প্রস্তাব উত্থাপিত করে বললো—তা তুমার আবার পইসার খাঁকতি হবি ক্যান্‌? যে রূপ, তোমার। একটু এমন-অমন করলিই তো…

মণি শিউরে উঠলো; কঠোর কণ্ঠস্বরে সে বলে উঠলো— বলার মা!

বলার মা মণির মুখের পানে চেয়ে দেখলো তার চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে।

আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লো সে—না, না, দিদিমণি তা' না, আমি বলছি কি, ঐ যে ছুকরা ডাক্তারবাবু আসেন, ইকটু বুদ্ধি

থাকলি…। না হয় ঐ বুড়ো বাবু আসেন। উনার কি সে সোমত্ত আছে, না বয়স আছে! নাতিন্ হও, একটু হাসি মস্কারা করলি, কি হাসতি হাসতি গায় ঢলি পলি, বুড়ো…।

রাগে বিরক্তি ঘৃণায় মণির দেহ নিষ্কম্প হয়ে গেছে, জিনিসটা তলিয়ে দেখতে গিয়ে তার সন্দেহ হলো এ যেন 'বলার মা'র নিজের কথা নয়। সে যেন ঐ বৃদ্ধের হীন মনোভাবকেই মার্জিত ভাষায় বলছে। নইলে কথার ফাঁকে ফাঁকে অমন জড়তা আসবে কেন?

মণিকে নির্বাক দেখে 'বলার মা' ভাবলো হয়তো তার ওষুধু কাজ করেছে তাই দু'পক্ষ বাঁচিয়ে প্রবীণার মতো উপসংহার টেনে যেতে লাগ্লো—তা' তুমার চাতি হবে কেন? সে যা' হয় আমি উনার সাথে বুঝ্পড়্ করবো।

মণির দৃঢ় বিশ্বাস হলো—এ-ও বৃদ্ধের উক্তির প্রতিধ্বনি; 'বলার মা'কে দোষী ভেবে তাকে গালি-গালাজ করলে প্রতিকার হবে না; বরং তাতে সে চ'লে যেতে পারে। সব দিক ভেবে সে তাকে নরম ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টায় বললো—ছ্যাখো 'বলার মা' তুমি আমার মায়ের বয়সী লোক, ওসব বিশ্রী কথা মুখে আনতে নেই; ওতে তোমার মেয়ের অকল্যাণ হবে।

নানা যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করলে যে ফল না হতো, মেয়ের অকল্যাণের ইঙ্গিতে তার চেয়ে সহজ ফল হলো। 'বলার মা' এক ছেলে এক মেয়ের মা। মণির বাক্যাঘাতে তার ভিতর

মা জেগে উঠলো। সন্তানের অমঙ্গলের কাছে মায়ের আর সব আকাঙ্ক্ষাই বুঝি তুচ্ছতর হয়ে যায়।

'বলার মা' হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলো—ভদ্দর-লোকের মেয়ে তো, সে কি এত অল্পে ইজ্জত দান করতে পারে। পাজি বুড়োটা তাকে কী অপদস্থ-ই না করলো। বলার মতো আর কিছু না পেয়ে সে বললো—তা, তুমার যা' ভালো লাগে তাই করো।

প্রায় মাস দেড়েক পরে মণির কাছে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে তার বাবার পত্র এলো। পত্রখানি পড়ে অনাথিনী মণির মন আশার অরুণিমায় রঙীন হয়ে উঠলো।

মুরলীবাবু লিখেছেন তাঁরা কয়েকজন সম্ভবতঃ আগামী মাসখানেকের মাধ্যে আবার যশোর জেলে স্থানান্তরিত হতে পারেন। যশোরে ফিরে গেলে মণি যাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে সে ব্যবস্থা করবেন। কয়েকমাসের অদেখা, তবু মণির মনে হয় সে যেন কত বছর বাবাকে দ্যাখেনি। বাবাকে দেখ্‌তে পাবার আশায় তার মন অশান্ত হয়ে ওঠে।

তিনি আরও লিখেছেন যে সেখানে পাবনা জেলার আরেক-জন রাজবন্দীর সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনায় বেশ হৃদ্যতা জন্মেছে। তরুণ রাজবন্দী বলিষ্ঠমনা, আত্মবিশ্বাসী এবং স্থির-প্রতিজ্ঞ। তার সাথে মুরলীবাবুর মতের মিল হয় না, তবু তরুণের অটল আত্মনিষ্ঠা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কারামুক্তির পর তিনি সেই তরুণ বন্ধুকে বাড়ীতে নিয়ে আসবেন।

মণি রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্য বোঝে না; তবু তার আজন্ম পরহিতব্রতী ঋষিতুল্য বাবার মতেরও যে কেউ বিরোধী হতে পারে, এ-ও মণির ধারণাতীত। সে তার বাবার মতের বিরোধী হয়েও তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এই রূপকথার রাজপুত্র সম্বন্ধে মণি মনে মনে এলোমেলো কল্পনার জাল বুনে চলে।

মণির বাবার যে বিরোধী, সে মণিরও বিরাগের পাত্র সন্দেহ নেই। আবার যখন ভাবে সে শত্রু হ'য়েও চিত্তহারী তখন মণির অকপট অন্তর অজ্ঞাতে যেন এই অলক্ষ্য শত্রুর দিকে প্রসারিত হয়ে যায়।

'বলার মা' সেদিন ভট্টাচাযি্য বাড়ী থেকে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার আগে জ্বর হয়ে মণিদের বাড়ী ফিরে এলো। মণির নিষেধ সত্ত্বেও রাত্রে ভাত না খেয়ে ছাড়লো না। পরদিন সকালে দেখা গেল 'বলার মা' জ্বরে বেহুঁস; তার গায়ে গুটি দেখা দিয়েছে।

গ্রামের প্রান্তে বসন্তরোগ দেখা দিয়েছে। মুচিপাড়ায় হু'জন মারা গেছে। ঐদিক থেকে ব্যাধি গাঁয়ের মধ্যে আসা আরম্ভ করেছে। ভদ্রপল্লীর মধ্যে এ বাড়ীতে প্রথমে ব্যাধি দেখা দিল।

মণি ব্যস্ত হয়ে কয়েকখানা নিমের ডাল ভেঙে এনে ঘরের মধ্যে রেখে দিল। বিকেলে দেখা গেল 'বলার মা'র সর্বাঙ্গ জলবসন্তে ছেয়ে গেছে।

মণি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লো। ঘনায়মান বিপদের আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে সে জয়গোপালবাবুর বাড়ী ছুটে গেল।

জয়গোপালবাবু তখন বেতের মোড়ার উপর বসে দু'জন চৌকিদারের সঙ্গে দেশের শাসন সংস্কার বিষয়ে গভীর আলোচনায় রত। পাশে ক্লান্ত হুঁকোটি বিশ্রাম করছে। সহসা অবিন্যস্তবেশা শঙ্কাতুরা তরুণীর অকুণ্ঠ পদার্পণে রাজপুরুষ দু'জন একটু চকিত হয়ে উঠলো।

জয়গোপালবাবু চেয়ে দেখলেন মণি দাঁড়িয়ে। মণি কিছু বলবার আগেই তিনি ব'লে উঠলেন--কী ভাগ্যি আজ আমার; নাতনী পায়ে হেঁটে বাড়ী হাজির যে।

চৌকিদার দু'জন একটু সরে দাঁড়াতেই তিনি তাদের লক্ষ্য করে বল্‌লেন--ওহে মোড়ল, তোমরা একটু তফাতে যাও, ইনি আমার তৃতীয়পক্ষ কি না! অবেলায় কী জন্যে এসেছেন শুনি, তারপর তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্‌বো।

—বুড়োর আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে,—বলতে বলতে চৌকিদার দু'জন সরে যেতে লাগলো।

মণির কানে সেকথা গিয়ে পৌঁছুলো। সে কাতরস্বরে বলে উঠলো—না, না, ওদের যাবার দরকার নেই। দাদু, 'বলার মার' মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে।

বৃদ্ধ আবিষ্টের মতো জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তাকে ছুঁয়েছো?

—আমি ছাড়া কে দেখ্‌বে তাকে?

বৃদ্ধ অত্যন্ত ভীতভাবে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মণিকে বললেন—সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও; কাছে এসো না।

মণি বিস্মিত হয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে বল্‌লো—কাছে যাচ্ছিনা দাদু ; আমাদের ধান থেকে পাঁচকাঠা ধান রেখে ক'টা টাকা দিন। ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

—ছোট লোকের অসুখ হয়েছে, আপনি সেরে যাবে। নিজে খেতে পায় না তার আবার ডাক্তার দেখানো। যত সব ইতরামি—

কথাগুলি শেষ হতে হতে বৃদ্ধ দ্রুতপায়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মণি বাড়ী ফিরে এলো।

পরদিন সকালে গাঁয়ের ডাক্তার ফণী বোস তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে ডিস্‌পেন্সারীতে যাচ্ছিলেন। মণি দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনলো। তিনি দেখে বল্‌লেন—ভয় নেই ; দুপুরে তিনি একটা গুঁড়ো ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন সরষের তেল দিয়ে গায়ে লাগিয়ে দিলে সেরে যাবে।

ডাক্তার ফিরে যাবার সময় মণি বললো—কাকা, একটু ভালো ওষুধ দেবেন। বাবা এলে আপনার পয়সা দিয়ে দেবো।

ডাক্তার হেসে বললেন—আচ্ছা, মা, হবে। পয়সার জন্যে তোমার ভাবনা নেই ; তোমার বাবা এলে আমি তাঁর কাছ থেকেই নেবো।

'বলার মা' ধীরে ধীরে সেরে উঠলো, কিন্তু রোগীর সেবা করতে করতে সেই রোগের বীজাণু সংক্রামিত হলো মণির দেহে।

মণির সারা গায়ে ছোট ছোট গুটি দেখা দিল। সংখ্যায় ও আকৃতিতে ভীতিজনক।

ফণীবাবু বলার মাকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন, তিনিই মণিকে দেখতে লাগলেন। ওষুধ গায়ে লাগানো হতে লাগলো কিন্তু একদিন যায়, দু'দিন যায়, গুটিগুলির বসে যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। স্বভাবভীরু মণি আরও শঙ্কিত হয়ে পড়লো। ফণীবাবু যাতায়াতের পথে তিন-চারবার এসে মণিকে দেখে যান, সাহস দেন। যেদিন সময় হয় সন্ধ্যার পর ডিস্‌পেন্সারী থেকে বাড়ী ফিরবার পথে কিছুক্ষণ বসে গল্প করে যান। অন্যমনস্কতার ফাঁকে মণি বলে ওঠে—কাকাবাবু, বাবার সঙ্গে আর আমার দেখা হলো না। ফণীবাবু হেসে বলেন—পাগলী কোথাকার, ভয় কী? অসুখ হয়েছে সেরে যাবে।

'বলার মা' সেবা-শুশ্রূষা করে, সময় মতো ওষুধ-পথ্য দেবার ব্যবস্থা করে, মণির সঙ্গে সারারাত্রি জেগে থাকে। মণি বলে—'বলার মা', আর জন্মে তুমি আমার আপনার লোক ছিলে, নইলে এমন কেউ কারুর জন্যে করে।

'বলার মা' জিভে কামড় খেয়ে বলে—ছি দিদিমণি, আমি তুমার ভারী কর্‌লাম! তুমি না থাক্‌লি আমারে কাল ব্যামোরতে বাঁচাতো কী ডা?

সেদিন ভোরে উঠে 'বলার মা'কে মণি বল্‌লো—'বলার মা', কাল রাত্তিরে আমি মাকে দেখিচি। মাঝ রাত্তিরে আমার একটু ঘুম এসেছিল, চেয়ে দেখি মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে,

কপালে বড়ো সিন্দুরের ফোঁটা, গালভরা হাসি, আমাকে কোলে নেবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

'বলার মা' চমকে উঠে বললো —ওসব স্বপনে দেখ্‌তি নেই দিদিমণি।

দিন চারেক যেতেই গুটিগুলো পেকে ওঠা আরম্ভ করলো। ডাক্তার এসে দেখে যায়, ওষুধের পয়সা লাগে না। পথ্যের খরচ বাবদ ডাক্তার কিছু দিতে গেলে মণি বলে—দরকার নেই কাকাবাবু, পথ্যির পয়সা ঘরে আছে।

এদিকে ঘরে চাল নেই, থাকলেই বা কে রেঁধে দেয়। 'বলার মা'র আর রাত্রে ওখানে খাওয়া হয় না। অন্য বাড়ীতে যেখানে ঝি-গিরি করে, সেখান থেকেই ক'দিন শেষ দুপুরে খেয়ে এসে রাত্রে না খেয়েই কাটিয়েছে। আজ দু'দিন মণির রোগবৃদ্ধি হওয়ায় সে তার কাছ্‌ ছেড়ে অন্যত্র কাজে যেতেও পারেনি। মণির হাতে যে কয়েক আনার পয়সা ছিল তাই দিয়ে চিঁড়ে খেয়ে কাটিয়েছে। আজ মণি বললো তুমি ও বাড়ীর দাদুর কাছ থেকে গিয়ে একজনের মতো চাল চেয়ে নিয়ে এসে এখানেই রেঁধে খাও, আমাদের ধান তো আছে।

'বলার মা' বিকেলে মণির নির্দেশানুসারে জয়গোপালবাবুর কাছ্‌ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে এসে বল্‌লো—বুড়ো দেলোনা দিদিমণি, বলে তুমাদের ধান কবে ফুরিয়ে গিয়েচে। তারপর সে নাকি নিজিরতেও অনেক দিয়েচে। আর দেবে না। আর কী কয় জানো? না, কবোনা নে।

—বলো না 'বলার মা', আমি রাগ করবো না।

—কয় কী—ছি, ছি, ছি, ছি! কয় যে ডাগ্‌দারবাবু তুমার একেনে আসেন ক্যান? তুমার নাকি তিনার সাথে...

অস্বস্তিতে পাশ ফিরতে গিয়ে গায়ের অনেকগুলি গুটির মুখ ছিঁড়ে গেল। বেদনায় সে কেঁদে উঠলো। বলার মা ভয়ে ভয়ে তার মাথার পাশে গিয়ে মাথায় কপালে হাত দিতে লাগলো। তারপর বলে উঠলো—এ কী? তুমার মাথার চুলির মাঝেও মার অনুগগুরু হয়েছে!

মণি সে কথা শুনলো না। তার মনে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো এক বেদনা—বৃদ্ধ শেষে তার নারীত্বের উপর দোষারোপ না করে ছাড়লো না। সেরে উঠে সে মুখ দেখাবে কী করে; তার কাকাবাবুই বা শুন্‌লে কী মনে করবেন! বৃদ্ধ গাঁয়ের প্রাচীন ব্যক্তি, অর্থশালী; সে যা প্রচার করবে, লোকে তো তাই শুন্‌বে। কে তার সত্যকে যাচাই করতে যাবে। শরীরে বেদনা, মনে বেদনা, আর কত সয়! অতি কষ্টে সে 'বলার মা'কে বললো তার বাবা-মায়ের যুগ্ম-ছায়াছবিখানি কাছে এনে দিতে। 'বলার মা' সেখানা এনে দিলে সে ব্যাধিক্ষত দু'হাতে সেখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে চোখ বুজে ফেল্‌লো।

পরদিন সকাল থেকে মণি অচৈতন্য হয়ে পড়লো। ভালো দেখতে পায় না, কথা বন্ধ, কিছু বল্‌লেও তা' বিকার রোগীর মতো অর্থহীন প্রলাপ। 'বলার মা' ডাকে—দিদিমণি, দিদিমণি! মণি আধ-চাওয়া চোখে তার দিকে তাকায়; ইসারায় কী যেন

বলে। ‘বলার মা’ বোঝে না। তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

ডাক্তার ফণীবাবু সকালে এলেন; মণিকে দেখে মনে মনে বললেন—স্মল পক্স, একেবারে চামড়ার নীচে পর্যন্ত হয়েছে। সব পেকে গেছে। এ একেবারে চিকিৎসার বাইরে।

বাড়ী এসে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ঠিকানায় মুরলী-বাবুর কাছে একখানা পত্র দিয়ে জানালেন—মণির স্মল পক্স হয়েছে; অবস্থা সিরিয়াস। দেখবার ইচ্ছা থাকলে যেন অবিলম্বে কারামুক্ত হয়ে বাড়ী আসবার ব্যবস্থা করেন।

পত্রখানি চারদিনে মুরলীবাবুর হাতে গিয়ে পৌঁছুলো। পড়ে তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। মাণিকমোহনকে চিঠিখানি দেখিয়ে তার পরামর্শ চাইলেন।

মাণিকমোহন মুরলীবাবুর কন্যাবৎসলতার কাহিনী অনেক শুনেছেন। তিনি বললেন—আপনি আবেদন করুন ‘বণ্ড’ দিয়ে ছাড়া পাবার জন্যে।

সরকারের নিয়ম আছে—যদি এই ধরনের রাজনৈতিক বন্দীরা এই মর্মে লিখিত আবেদনপত্র দাখিল করেন যে জীবনে তাঁরা আর কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হবেন না, তা' হলে কর্তৃপক্ষ অবস্থা বিবেচনায় তাদের মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন।

মুরলীবাবুর জীবনে এই প্রকারের বন্দীত্ব প্রথম নয়। আরো কয়েকবার তাঁকে সরকার বন্দী করে কারাকবলিত করেছেন।

কোনোবারই তিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে মুক্তির জন্য লালায়িত হননি। এভাবে কেউ আসতে গেলে তাকে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তিতে নিরস্ত করেছেন। কিন্তু আজ নিজের বেলায় যুক্তির খেই হারিয়ে যায়। লৌকিক কর্তব্যের উপর অন্তরের আকুতি জয়ী হতে চায়; স্নেহরসের উদ্বেলসাগরে ভারবাহী যুক্তির তরণী ডুবুডুবু হয়ে যায়।

যে কয়েকজন রাজবন্দীর সঙ্গে মুরলীবাবুর আন্তরিক জানাজানি হয়েছে তাঁরা সবাই মাণিকমোহনের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু মন যে সমর্থন করেও করে না। আজীবন পণ ভেঙে যাবে ?

দীর্ঘ দু'মুখী ভাবনার পর তিনি আবেদনপত্র দাখিল করলেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও আদেশ আসতে আরও কয়েক-দিন লেগে গেল।

মুরলীবাবুর স্থৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আসবার সময় তিনি সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। মাণিকমোহনকে বিশেষ করে বলে এলেন কারামুক্তির পর তাঁদের বাড়ীতে যেতে।

জেল গেটের প্রহরীরা জেনে গেল একজন বৃদ্ধ নিরাপত্তা রাজবন্দী 'বণ্ড' দিয়ে কারামুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। মুরলীবাবু জেলগেট পার হয়ে আসবার সময় তারা মুরলীবাবুর দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলো।

মুরলীবাবুর ওদিকে নজর নেই। সরকার রাজবন্দীদের মুক্তির পর বাড়ী ফিরে আসবার উপযোগী যানবাহনের ব্যয়

পদমর্যাদানুসারে দিয়ে দেন। মুরলীবাবু মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তাই থেকে কিছু বাঁচিয়ে মেয়ের জন্যে কমলালেবু আঙ্গুর কিনে সঙ্গে নিলেন। একবার তাঁর মনে হয় মণি নেই, আবার মনে হয়—না, নিশ্চয় আছে, এতদিনে হয়তো সুস্থ হয়েই উঠেছে। ফণী তো ডাক্তার মন্দ না।

সূর্য অস্ত যায়-যায়; মুরলীবাবু গাঁয়ে এসে পৌঁছুলেন। বাড়ীর আঙিনায় গিয়েই ডাকলেন—মণি, মা মণি, আমি এসেছি।

বাড়ী খাঁ খাঁ করছে, কোনো সাড়া এলো না। বহু মণির ছবি যেন দলে দলে তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করে বেড়াতে লাগলো।

'বলার মা' দেখতে পেয়েছিল মুরলীবাবু বাড়ী যাচ্ছেন। সে ছুটতে ছুটতে পিছন পিছন এলো। তাঁর সাথে চোখো-চোখি হতেই 'বলার মা' চোখে কাপড় দিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

বৃদ্ধের চাহনি কঠিন হয়ে এলো। হাতের সেই লাঠিখানির উপর ভর দিয়ে নিষ্কম্প বৃক্ষের মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ থেকে অসাড়ে কয়েকটি কথা বেরিয়ে এলো—না এসেই বা কী করবার ছিল আর এসেই বা কী করলাম।

ধীরে ধীরে সারা আকাশ ব্যেপে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

# ভগিনী

বহুদিন পরে বাড়ীতে চলেছি। বাড়ী যাবার আনন্দে নয়, অসুস্থ হয়ে। বাইরে থেকে অসুস্থতার চিহ্ন প্রকট নয়, তবু দুর্বল হয়ে পড়েছি মনে মনে।

কিছুদিন আগে ম্যালেরিয়ার মার খেয়েছি। কুইনাইনের পী[illegible] বীজাণুগুলি নিস্তেজ হয়ে আশ্রয় নিয়েছে প্লীহা-যকৃতের অন্তঃপুরে। লোকে জানে—জ্বর সেরে গেছে, কিন্তু আমার জ্বর-জ্বর ভাব কাটে না। বিকেলে শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করে, গাটা গরম হয়, আর ভাবি, রোজই জ্বর হচ্ছে।

পারগপক্ষে কুইনাইন খেতে চাই নে, কিন্তু নিরুপায়। দিনগত পাপক্ষয় করা চাকরী করি, তাতে বছরের শেষ। কাজের চাপ এখন এত বেশী যে, একদিন অনুপস্থিত হলে চাকরী খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই শরীর যত অক্ষমই হোক না কেন সক্ষমতার ভান তাকে না করে উপায় নেই।

অসহায় হয়ে কুইনাইনের শরণাপন্ন হতে হলো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশে। কুইনাইন খেয়েও যে জ্বর গেছে—এ বিশ্বাস মনে আসে না। চিকিৎসককে জানালাম আমার

অভিযোগ। তিনি হেসে বললেন - ক্রনিক ম্যালেরিয়াল পেসেণ্ট আপনি, একটা চেঞ্জ দরকার।

গাল-ভরা উপদেশ মেলে বিনামূল্যেই, কারণ তা' উপদিষ্টের অবস্থা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তা' পালন করতে হলে যে শক্তি দরকার তা' থাকে ক'জনের। হিতোপদেশে তাই ভীত হয়ে পড়লাম শুধু।

থাকি এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে। আলাপে ব্যবহারে অনাত্মীয়ভাব বড়ো পাই নে কারো কাছ থেকেই। অসুখের প্রয়োজনে সেবাও যে পাইনি তা' নয়। তবু অসুস্থতা যখন স্থায়ী হতে চললো, তখন মনে হতে লাগলো সেবারও যেন কোথাও ত্রুটী হচ্ছে। প্রয়োজনের সবটুকুই হয়তো পাই, পাইনে শুধু সেই অকারণ প্রাণের স্পর্শ টুকু, যা' অনায়াসে নির্জীবকে পারে জীবনছন্দে স্পন্দমান করে তুলতে।

আত্মীয়েরা সাহস দিয়ে বললেন, থাকো, সেরে যাবে। ভয় কী ?

মন মানতে চাইলো না সে কথা। গড়ে-তোলা আত্মীয়তার মধ্যে যে কোথায় একটু ফাঁকি রয়ে যায়, তা' এইবার প্রথম বুঝলাম।

সাত-পাঁচ ভেবে স্থির করলাম---বাড়ীতেই যাই। যা' হোক একটু জায়গা-ছাড়া তো হওয়া যাবে। তারপর বড়ো কথা, মায়ের কাছে যেতে পারবো।

এমন দিনও গেছে--যখন দিনান্তে একটিবারও মায়ের কথা

মনে পড়েনি। আর অসুস্থ মনে আজ বার বার মায়ের কথাটাই মনে পড়ে। মমতার ছোঁয়া-না-পাওয়া জীবনে মা যে কত বড়ো আশ্রয়, এর আগে তা' বুঝিনি।

কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে সাতদিনের ছুটি পেলাম। যশোর থেকে মোটর-বাসে উঠে গেলাম কালীগঞ্জ পর্যন্ত। সেখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে আছেন জননী আর জন্মভূমি। সঙ্গে বিশেষ কিছুই নেই, শুধু একটি ভাঙা স্যুটকেশ; তবু সামর্থ্য নেই —হেঁটে যাই।

অকারণ অর্থব্যয়ে তাই ভাড়া করতে হলো একখানি এক্কাগাড়ী। এক-ঘোড়ার গাড়ী সে। ঘোড়ার চলার তালে তালে আরোহীর সারা দেহ নৃত্যময় হয়ে ওঠে, কখন যে কোন্ অঙ্গে আঘাত লাগে ঠিক নেই। পাঁজরের অস্থিগুলি স্থানচ্যুত হবে কিনা তা'ও বলা যায় না। তবু ভরসা, নির্মম ঝাঁকানির দাপটে ম্যালেরিয়া রোগীর প্লীহা-যকৃতের যদি দর্প চূর্ণ হয়।

গাড়ী বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে—আর মনে পড়ছে মাকে, আর আমার মাতৃভূমির মাটিকে।

একাক্ষরী মায়ামন্ত্র 'মা' কথাটি ভাবলেই আমার মনে পড়ে চিরদারিদ্র্য-দলিতা ভোগবঞ্চিতা রুক্ষকেশা সর্বংসহা একটি নারীমূর্তি। আর 'দেশ' কথাটি মনে এনে দ্যায় অতীত গরিমার স্মৃতিকঙ্কাল একখানি জনবিরল গ্রামের ছবি।

গাড়ীখানা একটা মরা নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো—বুকভরা তার রক্তবীজের বংশধর কচুরী পানার আবর্জনা। একদিন এর

দেহে ছিল প্রাণের বেগ, অন্তরে অনন্তের আবেগ, হেসে খেলে হেলে দুলে গান গেয়ে সে চলতো সুমুখ পানে,—বাঁক থেকে বাঁকে—জানা থেকে অজানায়। সেদিন তার নাম ছিল—বেগবতী।

আজ তার প্রাণে সে বেগ নেই, অন্তরের সে আবেগ হারিয়ে গেছে। শীতের শেষে জল শুকিয়ে যায়, ফাল্গুন-চৈত্রমাসে এপারে ওপারে ছোট বালুচর জেগে ওঠে, এত অল্প জল থাকে যে, একটা ব্যাঙ্‌ও ইচ্ছামতো লাফ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে। তাই সে ভালো নাম খুইয়ে ডাকনামে পরিচিত হয়েছে—ব্যাঙ্‌ নদী। আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে এর মুখে। যে সমাজ একদিন দুর্দম প্রাণের বেগে ঋক্‌মন্ত্রের কলগর্জনে দু'তীর মুখরিত করে ছুটে চলেছিলো ব্যক্ত থেকে অব্যক্তের পানে, সান্ত থেকে অনন্তে, সসীম থেকে অসীমে, ভুবন থেকে গগনের পানে,—আজ সে সেই প্রাণবেগ হারিয়ে যুগসঞ্চিত কুসংস্কারপুঞ্জ বুকে নিয়ে অর্ধচেতন। আজকার কদর্য রূপ দেখে কে ধারণা করতে পারে তার সুদূর গরিমাময় অতীতকে!

বাঁশের সাঁকো পার হয়ে নলডাঙ্গা গ্রামের মাটিতে পা দিয়েছি। সানুরাগ স্নেহের স্পর্শে সারা দেহ আমার কণ্টকিত হয়ে উঠলো। যেন কোন্‌ পথ-চেয়ে-থাকা দীন-দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি আমি বহুদিন পরে আবার তার অঞ্চলতলে ফিরে গেছি।

বাড়ী গিয়ে যখন পৌছলাম তখন বেলা প্রায় চারটে হবে। অসুস্থতার সংবাদ আগে মাকে জানাইনি, পাছে তিনি বিচলিত

হয়ে পড়েন। না জানিয়ে এসেছি, না ডেকেই ধীরে ধীরে ঘরে উঠলাম মাকে একেবারে অবাক্ করে দেবো বলে।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, একটি মাদুরের উপর মা উপুড় হয়ে আছেন: সামনে একখানা পুরানো পাতা-ছেঁড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ খোলা। পাশে একটি ফুটফুটে সাদা রঙের বেড়াল। চোখ দু'টি তার ধ্যাননিমীলিত।

'মা' বলে ডাকতেই তিনি যেন একটু চমকে ধচ্‌মচ্‌ করে উঠে বসলেন। আমাকে দেখেই তাঁর মুখে হাসি ধরে না। মা উঠে এসে আমার চিবুক চুম্বন করলেন। মাকে প্রণাম করে চাইতেই দেখি বেড়ালটি আমার দিকে একটু অবজ্ঞা-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে মাদুর ছেড়ে একটু দূরে মাটিতে গিয়ে বসলো।

আগে অসুখের কথা না বলেই বললাম মা, বড়ো খিদে পেয়েছে।

—আচ্ছা, হাত-পা ধুয়ে বোস্। মা তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

হাত-পা ধুয়ে আমি ঘরে খাটের উপর একখানি বই খুলে বসেছি। সহসা দেখি বেড়ালটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। চোখোচোখি হতেই সে সরে গেল।

মা খেতে ডাকলেন। গিয়ে দেখি থালার উপর কিছু ভাত, ক'খানা বড়াভাজা আর খানিকটা পুঁইয়ের ডাঁটা চচ্চড়ি।

আমি বললাম—ভাত তো খাবো না মা।

—আর যে ঘরে কিছু নেই বাবা। মায়ের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠলো।

—আমার যে রোজ জ্বর হচ্ছে মা। তাই তো ছুটি নিয়ে এসেছি হাওয়া বদল করতে।

মা আমার কপালে গলায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন —জ্বর কোথায়?

—বাঃ রে! তোমার হাত গরম, বুঝতে পারছো না। আমার নিজের কাছে গা খুব গরম লাগছে।

মা রেগে গেলেন আমার কথা শুনে; বললেন—তোর ও বাতিক হয়েছে। সেবার একবার পা অস্ত্র করার পর পা ফুলে গেল, কয়েকদিন পা ফুলো-ফুলো ভাব ছিল। শেষে তা' সেরে গেলেও তুই রোজ পা টিপতিস্। আমার কাছে এলে পই পই করে নিষেধ করে করে সারিয়ে দিলাম। এবার আবার তোকে সেই বাতিকে ধরেছে।

বললেন বটে কথাগুলো, তবু মনের সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্য আবার আমার মাথায় কপালে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—আমি বলছি, ও জ্বর না; সেরে গেছে, তুই ভাত খা। ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু না খেলে আমার মনে ভালো ঠেকবে না।

মায়ের মুখের আশ্বাসবাণীতে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে না পারলেও মাকে খুশী কররার জন্যে বসলাম ভাত খেতে। ভাতে হাত দিয়ে দেখি জল নিঙড়ানো ভাত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- এ কি পান্তা ভাত মা?

--না, না, দুপুরে জল দেওয়া। একটু গরম ভাব পড়েছে কিনা, নষ্ট হবে বলে জল দিয়ে রেখেছি।

এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েছি, এমন সময় দেখি সেই বেড়ালটি মাকে ঘেঁসে পাতের কাছে এসে বসেছে।

মা তার গায়ে ধাক্কা মেরে বললেন যা' এখন বিরক্ত করিস নে।

সে বিস্মিত হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে একটু সরে গিয়ে আমার দিকে চাহনি ফিরালো। সে চাহনির ভাষায় একটু ঈর্ষার ইঙ্গিত। আমিই যেন মায়ের কাছে তার অনাদরের কারণ, অথচ আমি কে! আগে তো সে দেখেনি।

ওর মূক অভিযোগের ভাষা বুঝতে পেরে আমি আগেই চারটে ভাত নামিয়ে দিলাম ওকে। কিন্তু তাতে তার রাগ কমলো না। সে সেদিকে ফিরেও চাইলো না।

মা তার গায়ে হাত দিয়ে বললেন বাচ্চি আমার রাগ করেছে।

স্নেহের পরশ পেয়েই সে এগিয়ে এলো আমার পাতের দিকে। মা বললেন ও কি শুধু ভাত খায়? মাছের কাঁটা তো জোটে না। একটু দুধ বা বড়াভাজা টাজা না হলে ও সেদিন ভাতই খায় না। ইন্দুর টিন্দুর ধরে খেয়ে বেড়ায়।

মায়ের সঙ্গে কথা বলছি, এর মধ্যে সে চট করে হাত বাড়িয়ে আমার পাত থেকে একখানা বড়াভাজা শিকার করে ফেললো।

ওর দুঃসাহসে আমার ভীষণ রাগ হলো। যে বিড়াল আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, তার এত বড়ো আস্পর্দ্ধা। মারলাম জোরে তার গালে এক চড়।

অ্যাঁ—উঁ করে এক ডাক দিয়ে সে অমনি মায়ের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল।

—আহা, তোকে মেরেছে! মা তার গলার টুঁটিটা ধরে উঁচু করে আদর করলেন। মাটিতে নেমেই সে সহসা মায়ের কোলে লাফ দিয়ে উঠে বসলো। এবার সে নিরাপদ, আবার তাকে কে কী বলে।

আমার সত্যিই ঈর্ষ্যা হলো এবার। যে মায়ের কোলে আমি ছাড়া আর কেউ আশ্রয় পায়নি, সেখানে নির্ব্বিবাদে একটা বেড়াল আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। কিন্তু কী বলি, মায়ের আশ্রিতা সে।

মায়ের আদেশে নিজে হাতে সেই শিকার-করা বড়াভাজাখানি ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিলাম তার ভাতের উপর। মা তাকে কোল থেকে নামিয়ে বললেন- -যা, খা গে যা'!

নিঃসঙ্কোচে এসে সে খেতে লাগলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এ আপদটাকে কে আমদানী করলো মা?

মা একটু বিরক্তিভরে বললেন -কে আনতে গেছে। ও ওপারের কানাই পাটনীর বাড়ীর বেড়াল। তারা ছালায় ভরে নদী পার করে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল: ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে। আমাদের বাড়ীতে কয়েক দিন ঘোরাফেরা

করতে লাগলো। কী করি, হাজার হোক একটা জীব তো? ওকে ছুঁটো না দিয়ে আমি বিধবা মানুষ জল খাই কী করে।

কথা বলতে বলতে বিরক্তির ভাব কেটে গিয়ে ততক্ষণে মায়ের মুখে মৌন তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন—ও কিন্তু তা' বলে লক্ষ্মী বেড়াল। হোলা বেড়াল এলে ঝগড়া করে তাড়িয়ে দেয়। ইঁদুর ওর জন্যে বাড়ীতে একটাও নেই। আগে ইন্দুরে আমার লেপ কেটে তচ্‌নচ্‌ করতো।

বুঝলাম মায়ের স্নেহের রাজ্যে ও একটা বড়ো ভূখণ্ডের অধিকারিণী হয়ে পড়েছে। সে অধিকারে বঞ্চিত করবার সাধ্য আমার নেই। মনে মনে লজ্জিত হলাম আগেকার অনধিকার পীড়নের জন্য। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার উদ্দেশ্যে বললাম—খাওয়া হলে কিন্তু আমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাতে হবে মা। ছোটকালে যেমন করে তোমার পাশে বসে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতাম তেমনিভাবে শুনবো।

মা হেসে বললেন যাঃ। তুই এখন খোকা কি না। কত বড়ো বড়ো ইংরেজী বই পড়ে ফেলেছিস তুই।

মায়ের কথার প্রতিবাদ করতে যাবো, চেয়ে দেখি শ্রীমতী খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মায়ের পায়ের কাছে বসে করুণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাইছে। তার ভাষা যেন আমি আশ্রিতা অবলা পশু: "মানুষ তুমি, আমার স্নেহের নীড়টি ভেঙে দিয়ো না।

মা পুরানো কথার রেশ টেনে বললেন—হ্যাঁ, যা' বলছিলাম।

ও চুরি করে না কখনো- যা'ই সামনে থাক না কেন; শুধু আমরা খেতে বসলেই জ্বালাতন করতে থাকে।

--তবে আমার পাত থেকে বড়াভাজা তুলে নিল কেন?

---ও তোকে আপন ভেবে ফেলেছে, তাই।

আমি নিরুত্তর। খাওয়া দাওয়া শেষ হলো। অনেকদিন পরে বাড়ী এসেছি, দু'চারজন ছোটকালের বন্ধুদের সঙ্গে দ্যাখা করে সন্ধ্যার পরে বাড়া ফিরে এলাম।

শরীর ভালো না বলে মা সকাল সকাল কয়েকখানা পরোটা করে রেখেছিলেন। খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুতে গেলাম। পরিষ্কার কাঁথা রাত্রে ল্যাম্পের আলোয় সাদা দ্যাখাচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে থাকবার সময় এমন আরামে শোবার সুযোগ হয়নি। আজ নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পা ছড়িয়ে দিলাম। সহসা বিকট শব্দে ম্যা-ও করে চীৎকার করে বাচ্চি উঠে দৌড় মারলো। টের পেলাম আমার পায়ের চাপা খেয়েছে সে।

মা ও-ঘর থেকে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আবার মেরেছিস নাকি।

---না, মা! ও আমার বিছানার উপর শুয়েছিল, আমি টের পাইনি। আমার পা ওর গায়ে লেগে গেছে। ও কি তোমার বিছানায় থাকে?

- কী করি। রোজ রাত্তিরে একটা হোলা বেড়াল এসে ভারী জ্বালাতন করে। বাচ্চি যে দর্জাল; বাইরে থাকলেও ঝগড়া করে মরে, আর আমার ঘুম হয় না। তাই জব্দ করবার

জন্যে ওকে আমি বিছানায় রাখি। তা' বলে ও খুব পরিষ্কার থাকে কিন্তু।

মায়ের অতগুলি কথার মর্মার্থ মনে ভাবনার ঢেউ তুলে গেল। কী আর বলি, মায়ের আশ্রিতা সে। বললাম --না মা, তাতে হয়েছে কী? ও থাকে, থাকবে। মা খুশী হয়ে চলে গেলেন।

মায়ের কাছে এলেই উজান স্মৃতির স্রোতে আবার শিশুকাল ফিরে আসে। মনে হয়, সেই যেমন মায়ের কোলে ছোট শিশুটি ছিলাম, আজও তেমনিটিই আছি। বড়ো হয়েছি বলে যেটা ভাবি - সেইটাই বড়ো ভুল।

বাড়ী আসবার পর থেকে আর জ্বর-জ্বর ভাব টের পেলাম না। মায়ের অন্তরের শুভেচ্ছাসিক্ত পথ্য সঞ্জীবনী সুধার মতো কাজ করলো আমার রক্তপ্রবাহে।

তার পর কত না আত্মীয়তা হয়ে গেল বাচ্চির সঙ্গে। মায়ের মুখে রোজই তার গল্প শুনি, তার সংযমের, তার বিশ্বস্ততার, তার গৃহনিষ্ঠার, শিকারপ্রিয়তার—আরো কত কী। বুঝতেও বিশেষ বেগ পেতে হয় না কোন্ চোরা গলি বেয়ে মায়ের হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে একখানি আসন সে অধিকার করে বসেছে।

আমার আর ভাই-বোন নেই, আমিও কাছে থাকি না। মায়ের হৃদয়ের অগাধ স্নেহ-জলধি উদ্বেল হয়ে ওঠে প্লাবনের বেগে : শুধু ক্ষেত্রের অভাব। আমার অনুপস্থিতিতে বেড়ালটি সেই অভাব পূরণ করে, তাই সে মায়ের কাছে এত আদরের।

আমার সঙ্গেও কম মাখামাখি হয়নি বাচ্চির। যখন তখন আসে আমার কাছে। অবোধ ভাষায় কত কী বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে। বুঝিনে তার অর্থ, শুধু তার মর্মটুকু আমার মর্মের মধ্যে এসে রহস্যময় ইঙ্গিত রেখে যায়। কখনো এসে পাশে বসে, কখনো কোলের উপর উঠে আসে, কখনো সোহাগে চঞ্চল হয়ে পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। একসঙ্গে আমরা খেতে যাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, একসঙ্গে বিছানায় শুই, একসঙ্গে বসে মায়ের স্নেহ ভাগ করে দু'জনে ভোগ করি।

সাত দিনের ছুটি ফুরিয়ে এলো। মা বললেন আরো ক'দিনের ছুটি নে না। কিন্তু আমি তা' নিতে পারলাম না।

যাবার দিন বাড়ী থেকে বেরুবার আগে মাকে প্রণাম করছি, হাতে সেই স্যুটকেসটি মাত্র। বাচ্চি বার বার আমার পায়ের উপর এসে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। তার ভাষা হয়তো আমি বুঝি, কিন্তু আমার ভাষা তাকে কেমন করে বুঝাই।

মা বললেন বাচ্চি, ও যে আজ চলে যাচ্ছে। বাচ্চি তাড়াতাড়ি উঠে মায়ের পা দু'খানি শুঁকে আমার মুখের দিকে চায়, আবার আমার পায়ের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে।

আমি তাকে কোলে তুলে বললাম আমি যাচ্ছি বাচ্চি। তুমি মায়ের কাছে থাকো। আবার আমি আসবো। ফ্যাল ফ্যাল করে সে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। মা পশ্চিমের ঘরের দরজার নীচে দাঁড়িয়ে আমার পথের দিকে চেয়ে রইলেন। বাচ্চি একবার মায়ের কাছে যায়, একবার আমার পথ বেয়ে কিছুদূর আসে, আবার ফিরে যায়।

ভাই-বোনের পরশ-না-পাওয়া আমার পথে চলতে চলতে বার বার মনে হতে লাগলো---যাক, এবার বাড়ীতে এসে একটি ভগিনী পেলাম।

# অভিযান

সংবাদটা শুনে একজন ছাড়া একে একে সবাই বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলো।

সান্ধ্য-আসরটা বেশ জমে উঠেছিল। পুরানো একতলা দালানের একখানা এঁদো ঘর। দপ্‌দপ্‌ করে গোটা তিনেক হেরিকেনের আলো জ্বলছে। এক পাশে দাবা, এক পাশে তাস, এক পাশে ক্যারম চলছে। দূরে এক কোণে উবু হয়ে বসে একজন তবলায় হাত সাধছে। তার পাশে খালি গলায় একজন অঙ্গভঙ্গীসহকারে সাধনা করছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

কিন্তু সংবাদ শুনে সবাই কেমন যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়লো। সবারই হৃদয়ের সমবেদনার তারে বেজে উঠলো ঐক্যতানিক ঝঙ্কার। এত বড়ো অন্যায় এ যুগে হতে দেওয়া চলে না। প্রতিকার চাই, নিশ্চিত প্রতিকার।

সংবাদবহ আগন্তুক ক্লাবঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। নভোচুম্বী শীর্ণদেহ সাইকেলের উপর ঈষৎ হেলানো। হ্যাণ্ডেলের গায়ে একটা ময়লা কাঁচ পরানো হেরিকেনে কুত কুত করে আলো জ্বলছে।

অস্বস্তিভরা কণ্ঠস্বরে সম্ভাব্য ঘটনাটা বিবৃত করে আগন্তুক

গৃহস্থ তরুণদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে—কী, আপনারা যাবেন কি না বলুন? দেরী করলে সর্বনাশ। রাত্রি সাড়ে ন'টায় লগ্ন। না যান তো বলুন, আমি একাই এর প্রতিবিধান করবো।

তার উত্তেজনাময় দেহের কাঁপনে সাইকেলের পুরানো বেল প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। সে বলে—একি মগের মুল্লুক না কি? একটা ষোলো সতের বছরের সুন্দরী মেয়ে। বাবা নেই বলে তার মামা পয়সার লোভে একটা পঞ্চাশ বছুরে বুড়োর সঙ্গে ঘুরিয়ে দিতে চায়। দিস্ ইজ্ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী; আমরা মরিনি এখনও। আগে ঐ মেয়ের মামাকে দেখে নেবো। এর চেয়ে মেয়ের গলা টিপে মেরে ফেলা অনেক ভালো।

ক্লাবঘরের অবিবাহিত তরুণমহলে বেশ একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সবাই উঠে দাঁড়ালো একে একে।

দাবার আসরের মাণিক বোস অ-দ্যাখা আততায়ীর উদ্দেশ্যে ঘুষি পাকিয়ে জোর পরখ করবার জন্যে মারলো ঘরের দেয়ালে এক ঘা।

নকু কর বেচারী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনা করছিল। সে ঐ দেখে হো হো করে হেসে উঠলো।

মাণিক বোস তার হাত ধরে টেনে এনে বললো—দ্যাখ্ অনেক দিন বক্সিং অভ্যাস নেই। আজ হয়ে যাক এক হাত। তুই লম্বা আছিস, মেয়ের মামাকে পাছড়ে ধরবি। আমি, বেশী না, দুটো ঘা বসিয়ে দেবো থুত্নীতে। তার বজ্রমুষ্টি এগিয়ে গেল নকু করের নাকের দিকে।

তাসের আসরের অনিল বাঁড়ুয্যে রুখে এগিয়ে এলো বলতে বলতে—আর সে বুড়ো বর ব্যাটারও একটা গতি করতে হবে তো। নিশ্চয়ই ও ব্যাটা মেয়ের মামাকে টাকা দিয়ে হাত করেছে।

বিনয় সরকার বলে উঠলো—আরে, বরকে ও সব না। জল-বিছুটি দিয়ে পা থেকে মাজা পর্যন্ত কসে দিতে হবে। তা' হলে ভিতরের জ্বালা একটু কমবে।

তারা ভঞ্জ আগের বক্তার খেই ধরে বললো—আরে শুনেছিস বর নাকি এক ইস্কুলের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার। তার আগের পক্ষের মেয়েরও নাকি বিয়ে হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, এবার মা-মেয়েতে কম্পিটিশন চলবে আর কী! নীরদ ঘোষ চশমার উপর দিয়ে তারা ভঞ্জের দিকে চেয়ে গম্ভীর-ভাবে হেসে উঠলো।

ঠিক হয়ে গেল অন্যায়ের প্রতিবিধান করতেই হবে। প্রস্তুত হয়ে সবাই ঘর থেকে বেরুবার উদ্যোগ করলো। একটা লোক তখন কোনো দিকে কর্ণপাত না করে অসহায়ের মতো দাবার ঘুঁটিগুলি গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

সে আধপোড়া বিড়িতে টান মেরে মুখ ফিরিয়ে বললো তোরা কি সত্যিই যাবি তবে?

—যা—বো? আপনার গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই বাচ্চুদা?

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আপন মনে বাচ্চু দত্ত বললো—যাবি যা, বিয়ের আগে এ সব ব্যাপারে একটু উৎসাহ বেশীই থাকে। তবে

আমি ভাবছি—গিয়ে কী করবি! আচ্ছা আমি থাকছি, ঘুরে আয় তোরা, তারপর আর এক দান হবে।

দশ বারোজন উৎসাহী যুবকের মিছিল গিয়ে থামলো বিয়ে বাড়ীর অঙ্গনে। বড়ো একখানা আটচালা ঘরের মধ্যে বরযাত্রীর আসর। গ্যাস লাইটের আলোয় ঘরের ভিতর আলোকিত। দরজার সামনে দাঁড়ালেই ছ্যাখা যায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বর বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে সজোর হুলুধ্বনি ভেসে আসছে মেয়েদের মহল থেকে।

মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সেই সংবাদবহ দূত, কানাই চাটুয্যে।

কেউ বলে -আগে আমরা বরকে দেখবো। কেউ বলে—না, আগে মেয়ে দেখবো; আমরা তার কাছে জানবো, তার এ বিয়েতে মত আছে কি না।

-- আরে কানাই যে। কী খবর, বোসো, বোসো। এঁরা কারা? অবিন্যস্তবেশী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার পথে কানাইকে দেখে প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে, এরা আমার বন্ধু। এই টাউনেরই ছেলে। এঁরা এসেছেন বিয়ে দেখতে।

-তা বেশ তো। আমার দায় তো তোমাদেরই দায়। তোমরা তো পর নও। মনে করো তোমারই বোনের বিয়ে। একটা সতরঞ্চি-টঞ্চি চেয়ে নিয়ে বসতে দাও এঁদের।

ভদ্রলোক আর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন।

দলের ভিতর থেকে বক্সার মাণিক বোস জিজ্ঞাসা করলো –আরে, ও লোকটা কে রে কানাই?

—মেয়ের মামা।

—আগে বলিসনি কেন? হাতের কাছ থেকে শিকার ফসকে গেল।

কানাই ইসারায় হাত উঁচু করে নিষেধ জানিয়ে বললো আগে থেকে হট্টগোল করলে সব মাটি হয়ে যাবে।

কিন্তু উৎসাহীরা উত্তেজিত। কারো ত্বর সয় না। যা' হয় একটা কিছু শীগ্‌গীর সেরে ফেলাই ভালো।

যে ঘরের ছাঁচতলার কাছে তারা দাঁড়িয়েছিল সেখানা একখানা ছোট চালা দেওয়া ঘর। সেই ঘরের মধ্যেই একজন মেয়ের নেতৃত্বে চলছিল কনে-সজ্জা।

সহসা একজনের নজর পড়লো ঘরের মধ্যে। দরজার সামনে মুখ করে হেরিকেনের আলোর কাছে বসে আছে কনে। কত শোভন অশোভন হাসি-তামাসা চলছে তাকে উদ্দেশ্য করে। সে নীরব, নিস্পন্দ। খোলা দরজার দিকে সে চেয়ে আছে। হৃদয়ের শূন্যতা যেন নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে দুটি কালো চোখের আলো বেয়ে।

—কানাই, ঐ বোধ হয় মেয়ে, না?

- হ্যাঁ, চুপ।

ষোলো সতের বছরের তরুণী। ছিপছিপে গোলগাল গড়ন।

প্রচুর হিমানী পাউডারের প্রলেপ সত্বেও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যটুকু চাপা পড়েনি। চন্দনচর্চিত মুখখানি দেখে মনে হয় যেন নির্মল আকাশ শত শত তারার ইঙ্গিতে প্রকাশ করছে তার হৃদয়ের অজ্ঞাত রহস্যসম্ভার।

মেয়েরা কনেকে নিয়ে ওপাশে চলে গেল। উঠে দাঁড়াতেই বাইরের অপেক্ষমান জনতার সঙ্গে একবার চোখোচোখি হলো তার। হেরিকেনের স্তিমিত আলোয় দ্যাখা গেল মেয়েটির চোখ দুটি জল-ছলছল।

বাইরে একটু দূরে তখন সানাই বাজছে। তার করুণ সুর-মূর্ছনায় ধ্বনিত হচ্ছে চিরন্তন তরুণী হৃদয়ের যুগযুগান্তব্যাপী কোনো গূঢ় মর্মবেদনার ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস।

দলের লোকের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে মেয়ের এ বিয়েতে মত নেই। সবাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো অবস্থার ত্বরিত প্রতিবিধানের জন্যে। প্রত্যেকেই এক একটি সুচিন্তিত উপায় উদ্ভাবন করে প্রকাশ করতে লাগল দলপতির অনুমোদনের জন্যে। উদ্দীপনাময় কথার স্বরে বেশ একটা ছোটখাটো সোরগোল সৃষ্টি হয়ে উঠলো।

শেষ পর্যন্ত স্থির হলো মেয়ের মামাকে ডেকে এনে সব বলে এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপসে না হলে বলপ্রয়োগ।

কে ডাকতে যাবে? কানাই ছাড়া আর কারো মেয়ের মামার সঙ্গে পরিচয় নেই। কিন্তু অত্যুৎসাহী কানাই রাজী হয় না। কী বলে ডাকবে ভেবে পায় না।

মেয়ের মামা এমনি সময়ে আবার ব্যস্ত হয়ে ঐ পথেই যাচ্ছিলেন। বক্সার মাণিক বোসই এগিয়ে গিয়ে ডাকলো তাঁকে।

—শুনুন, একটা কথা আছে।

মেয়ের মামা এগিয়ে এসে কানাইকে এবং তার বন্ধুদের সেইভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবিনয়ে বললেন —আরে, কানাই, তুমি এখনো এঁদের বসতে দাওনি? তুমি তো নিজের লোক বাপু।

—আমরা বসতে আসিনি; আপনার ব্যস্ত হতে হবে না। সেই কম্বুকণ্ঠস্বর।

—আজ্ঞে বলুন তবে কী করবো?

—এ বিয়ে হবে না।

মেয়ের মামা আকাশ থেকে পড়লেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলেন—আপনারা বলেন কী? আর এক ঘণ্টা পরেই যে লগ্ন!

—আজই বিয়ের সব লগ্ন ফুরিয়ে যাবে না। আবার আসবে। আরেকজন বলে উঠলো।

—কানাই ছিল পুরোভাগে। এবার চক্ষুলজ্জা বাঁচাতে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে দলের পিছনে যেতে লাগলো।

—কিন্তু কেন বলুন তো? মেয়ের মামার কণ্ঠে একটা ব্যস্ত জিজ্ঞাসা।

—একটা পাকা-চুলে বুড়োর সঙ্গে আপনি আপনার ষোড়শী ভাইঝির বিয়ে দিতে চলেছেন; কত টাকা খেয়ে মেয়েটার

সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন? পয়সা আয়ের আর পথ খুঁজে পেলেন না?

ভদ্রলোক বজ্রাহত। কী বলে এরা? বাপহারা নিঃসহায়া মা-সম্বলা মেয়ে। আজ পাঁচ ছ' বছর ধরে তাঁর সংসারে প্রতিপালিত হচ্ছে। গরীবের সংসার, সামান্য কেরাণীগিরির আয় আর কিছু জোত জমি ভরসা। তাই দিয়েই তিনি বোন, বোনঝিদের, নিজের ছেলেমেয়েদের লালন পালন করছেন। নিজের মেয়েও বয়স্থা হয়ে উঠেছে। তা' সত্বেও তিনি অস্বচ্ছল সংসারের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে কিছু ঋণ করে ভাগনীর বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। পাত্রও খারাপ না। শিক্ষিত, ইস্কুল মাষ্টার। স্বচ্ছল গৃহস্থ ঘর, একমাত্র বয়স একটু বেশী, দোজবর। তাতে কী, সধবা থাকা না থাকা তার কপাল। অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই কি আর মেয়ে বিধবা হয় না? তা' ছাড়া ভগবান না করুন, এমন অমন হলেও অন্নবস্ত্রের জন্যে তাকে পথে বসতে হবে না। এ বিয়ে ভেঙে গেলে হয়তো তাঁর মতো সঙ্গতিহীন লোকের পক্ষে আর কোনো সম্বন্ধ সংগ্রহ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু তিনি ভেবে পান না এ গুজব রটালে কে? কানাই? তাঁর পাশের বাড়ীর ছেলে কানাই? অবাধে সে এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতো, নিজের বাড়ীর ছেলের মতো অবাধে সে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতো—তারই এ কাজ!

কী জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে

পড়লেন। সাত পাঁচ ভেবে বললেন—কিন্তু যা শুনেছেন, ভুল। এ বিয়ে না হলে মেয়েটির সর্বনাশ হবে।

-আচ্ছা সে দ্যাখা যাবে। দেশে ছেলের আকাল হয়নি। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল মাণিক বোস।

দলের ভিতর থেকে একজন প্রস্তাব করে উঠলো—যাঃ যাঃ, ও ভদ্রলোককে ছেড়ে দে। ওঁর আর দোষ কী! আমরা বরকে চাই।

—তা মন্দ না। কত টাকার জোর হয়েছে তার একবার শুনি? টাকার জোরে এ যুগে সব রকম অন্যায় করা যায় না।

মেয়ের মামা আত্মসম্মানের ভয়ে হাত জোড় করে বললেন-- দেখুন, আপনারা বরপক্ষের সঙ্গে কোনো অভদ্রতা করবেন না। দোহাই আপনাদের। দু' কথা মন্দ বলতে হয় আমাকে বলুন। অন্যায় যদি হয়ে থাকে তো সে আমার। কিন্তু কী করবো, আমার এর বেশী সাধ্য ছিল না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যান। আমরা অভদ্রতা করছিনে। আমরা বরকে সসম্মানে ফিরে যেতে বলবো। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত মেয়ের মামার নাকের কাছ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বক্তার মাণিক বোস বললো।

মেয়ের মামা নিরুপায় হয়ে চলে গেলেন। দল এগিয়ে গেল বরযাত্রী ঘরের সামনাসামনি। দলের অগ্রণী কানাই তখন সাইকেলখানা রাস্তামুখো ঘুরিয়ে নিঃশব্দে দলের পিছনে দাঁড়িয়ে। উত্তেজিত তরুণদলের কারো তা' চোখে পড়লো না।

বরযাত্রী আসরের মাঝখানে দরজার মুখো মুখ করে তাকিয়া হেলান দিয়ে বর বসে। ডান হাতের কাছে টোপরটা রয়েছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা। চুলে কোথাও ধূসরত্বের চিহ্নমাত্র নেই। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে গোঁফের দ্বিবর্ণত্ব চোখে পড়ে।

দলের পুরোভাগে তখন মাণিক বোস। সহসা বরকে হাসতে দেখে দরদী দল আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অনিল বাঁড়ুয্যে বলে উঠলো· দেখিছিস্, ব্যাটা চুলে কলপ লাগিয়ে ছোকরা সেজেছে। অথচ ঐ ছ্যাখ, গোঁফে কলপ লাগাতে ভুলে গেছে।

---আবার মুচকি হাসছে। শয়তান কোথাকার। —নকু করের কণ্ঠস্বর।

- ওরে থাম্। বেরিয়ে আসুক আগে। বেশী তেড়িবেড়ি করলে এই একটা ব্লোর ওয়াদা। -মাণিক বোসের কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

বাদানুবাদ ছোট্ট একটি সোরগোলের আকার ধারণ করে ওঠে। বরপক্ষের এ জন বারান্দায় এসে সব ব্যাপারটা জেনে বরকে গিয়ে বললো। বর শুনে কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। বললেন আচ্ছা, বলোগে বর ওঁদের সঙ্গে ছ্যাখা করতে আসছেন।

ধবধবে নেটের গেঞ্জি গায়ে, ফিন্‌ফিনে ধুতি কাপড়ের কোঁচা বাঁ হাতের উপর এলিয়ে বর এগিয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন তরুণদলের সামনে।

দলের অগ্রবর্তী দুঃসাহসী মাণিক বোস দলের পক্ষ থেকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

বর দলের কাউকে প্রথমে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই করজোড়ে বলতে লাগলেন---দেখুন, আমি সব শুনেছি। এ বিয়ের বিরুদ্ধে আপনারা প্রবল প্রতিবাদ জানাতে এসেছেন ; সেজন্যে আর যে যাই ভাবুন, আমি খুশীই হয়েছি। দেশের ভরসাস্থল প্রাণবান যুবক আপনারা, এ আপনাদের দরদী প্রাণেরই পরিচয়। এ ধরণের অন্যায়ের প্রতিকারও আপনাদেরই হাতে। আপনারা যেদিন শুধু কথার দরদ নয়, প্রাণের দরদ নিয়ে এগিয়ে আসবেন, সেদিন থেকে দেখবেন আমাদের বয়সী লোকেরা সাহস করবে না কোনো তরুণীর পাণিগ্রহণ করতে।

—ও সব গরম বক্তৃতায় আমরা ভুলছিনে···গলায় খ্যাকর দিয়ে মাণিক বোস প্রতিবাদ জানালো। আর কেউ কোনো কথা বললো না।

বর ও-কথা শেষ হতে না দিয়েই বলে উঠলেন আপনারা শিক্ষিত যুবক ; আমার বক্তব্য আগে শেষ করতে দিন, বাধা দেবেন না। তারপর আপনাদের যা বলার থাকে বলবেন। আমি তো আপনাদেরই মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি।

এবার সবাই নীরব হলো। বর বলতে লাগলেন আপনারা আমাকে সসম্মানে ফিরে যাবার প্রস্তাব দিতে চান। আপনাদের প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা। মেয়েটি আজই সৎপাত্রস্থা হলো

দেখে যেতে চাই। আমি বিয়ের সব খরচা বহন করবো। আপনাদের মধ্যে থেকে যে কোনো যুবক এগিয়ে এসে ওকে এই লগ্নে বিয়ে করতে রাজী হন। সব প্রস্তুত, কোনো বেগ পেতে হবে না।

একটু চুপ করে থেকে মাণিক বোস বললো—আচ্ছা, কানাইয়ের ইণ্টারেষ্টটা যখন বেশী, তখন তাকেই বলে দেখি। এই কানাই! কানাই!

উত্তর এলো না। মাণিক বোস পিছনে ফিরে ছাখে কানাই তো নেই-ই, তার পশ্চাদ্বর্তীরাও কখন উঠোন পেরিয়ে বাইরের দরজার কাছাকাছি হয়ে পড়েছে।

- কোথায় গেল কানাই? এই কানাই! মাণিক বোস জোর গলায় হাঁক ছেড়ে ওঠে।

উঠোনের ওপার থেকে অনিল উত্তর ছায়—কোথায় তোর কানাই? বেগতিক দেখে অনেকক্ষণ আগে সে ভেগে পড়েছে।

—মার শালা কানাইকে। বক্সারের বজ্রমুষ্টি নিষ্ফল আক্রোশে ক্ষণিকের জন্য উঁচু হয়ে উঠলো।

-সে এখন তোমার মারের বাইরে। অনিল দলের কয়েকজন সমেত সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় কেটে পড়লো।

নিরুপায়ের মতো বক্সার মাণিক বোস বরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বরের মুখ তখন নিঃশব্দ ব্যঙ্গের হাসিতে প্রৌঢ়ত্বের জড়িমাজাল ছিন্ন করে যৌবনের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে।

# ছন্দোপতন

—বিয়েটাকে কি লাইফ ইন্‌সিওরেন্স মনে করো মা? ছেলে হলে বছর কুড়ির তার মানুষ করার প্রিমিয়াম চালাতে পারলে একেবারে এককালীন লাভ? মায়ের কথার জবাব দিয়ে ছেলে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—সব তাতে তোর দুষ্টুমি। আমার অসুখ হয়ে পড়লে ছাখে কে? খেটে খেটে আমার গতর পড়ে গেল: পারবো না আমি আর তোর সংসারে খাটতে। মায়ের কথায় একটা কৃত্রিম রাগের ভাব ফুটে ওঠে।

ছেলে মায়ের মনে একটা খোঁচা মারবার জন্যে খুনসুড়ী করে বলে ওঠে—নাঃ! ঐ ভয়ে আমি বাড়ী আসতে চাইনে। এই মাস দু'য়েক পরে আসছি, তা' স্বস্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি। আর আজকের দিনটা থেকে কাল সকালেই তো যেতে হবে।

মায়ের রাগটা এবার মিনতিতে পরিণত হয়, মুখে হাসি টেনে এনে বলেন—সত্যি তুই একটা বিয়ে কর বাবা। কাজকর্ম আমিই সব করবো। আগুনের জ্বাল তাকে পোয়াতে হবে না। সে দু'বালতি জল তুলে দিল কি মাছটা তরী-তরকারীটা কুটে

দিল, তাতেই আমার হবে। আর তাছাড়া ছোট্ট একটা মেয়ে বৌ সেজে দিব্যি ঘুরঘুর করে আমার সামনে ঘুরে বেড়াবে—সে আমার কত আনন্দের কথা।

মায়ের রঙীন কল্পনায় বাধা দিতে ছেলের ব্যথা লাগে অথচ বিয়ে করাও এখন তার ইচ্ছা নয়। কী করে? ছুদিক বজায় রেখে সে বলে—আচ্ছা, এতদিন যখন গেল আর ছু'একদিন না হয় সবুর করো। দিনকালের যে অবস্থা। এখনো একটা ভালো চাকরী বাকরী কিছু জোগাড় করতে পারলাম না। আজকাল মেয়েদের যে উঁচু রুচি তাতে আমাকে বিক্রী করলেও তোমার বৌমার শাড়ী ব্লাউজের দাম উঠবে না। ছেলে আবার খিল খিল করে হাসে।

পুরুষের একটা বয়স আছে যখন নারী-নেশা গোপনে মনকে পেয়ে বসে। অবস্থার চাপে সে বিয়ে করবে না বললেও, সত্যি সত্যি না করলেও, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নারী-সান্নিধ্যের কথা পরের মুখ দিয়ে শুনতেও মন্দ লাগে না। মন বলে চাই চাই, মুখ বলে চাইনে।

আজকালকার মেয়েদের উপর জাতিগত আক্রমণ মায়ের সমর্থন পায় না। ছেলের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন—সব মেয়েই কি সমান হয়রে? মেয়ে যদি মাঝারি ঘরের হয় আর বয়েস-খাওয়া না হয় তা হলে ওরকম হবে কেন? মেয়েরা সব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ছেলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

মা নিজের কথার খেই ধরেই বলতে থাকেন—তোর অত ভাবনা কিসের ? আমি কি খালি হাতে বৌয়ের মুখ দেখবো ভাবিস ? আমার তো আর দশটা পাঁচটা ছেলে মেয়ে নেই। আমার যা' কিছু সে তো তোরই।

বলতে বলতে তাঁর মন সহসা চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে অনেক কথা। সে বয়সে আশার আবেশ নেশার মতো মনে জড়িয়ে থাকে, সেই বয়সেই অদৃষ্ট করলো তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর পরিহাস। বৈধব্য তার নির্বিকার শুভ্র মূর্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। তাঁর স্বামীর পুত্রমুখ দেখবার বড়ো সাধ ছিল। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে তাঁরা দেবতার কাছে মানত করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। দেবতাও বিমুখ হননি। ছেলে যখন আটমাস গর্ভে এসেছে তখন স্বামীর হলো জীবন-সংশয় পীড়া। গ্রামের ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেল। রোগীকে আনা হলো কোলকাতায়। দু'মাসের মাথায় রোগ ভালো হয়ে এলো। এই সময় ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। কোলকাতায় থেকে রোগী খবর পেলেন। শুভসংবাদে তাঁর রোগপাণ্ডুর মুখের উপর দিয়ে আচমকা একটা সলজ্জ আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

বাড়ীতে যাবেন ঠিকঠাক। পুত্রমুখ দেখবার জন্যে সোনার চিক্ গড়ানো হয়ে গেল।

কল্পনায় নবজাতকের ধ্যানমূর্তি জেগে ওঠে। কেমন সে হবে ? গোলগাল না রোগাটে ; মায়ের রঙ্ পেলো, না বাপের রঙ্। মুখের আড়া বাপের মতো, না মায়ের মতো। দ্বিমুখী

ভাবনা চলে মনে মনে। বিচার সহসা কোনোপক্ষেই রায় দিতে পারে না। জগতের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত শিশু একসঙ্গে এসে ভিড় করে চোখের সামনে।

সহসা রোগ আবার তার মুখোস খুলে কঠোর রূপে দ্যাখা দিল। ডাক্তাররা বললেন, সহসা আনন্দের উত্তেজনায় রোগ আবার রিলাপ্স্ করেছে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন, চারদিনের দিন সব শেষ। পুত্রমুখ দেখার আশা তার ভাষা পেলো না।

ব্যর্থ সান্ত্বনার প্রলেপ মাখিয়ে প্রসূতিকে সে দুঃসংবাদ জানানো হয়ে গেল। প্রসূতি কোলের শিশুকে সোহাগে জড়িয়ে ধরে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর সে সর্বংসহা সদ্য জননীরূপিনী নারীমূর্তির এক চোখে দেখা দিল অশ্রুবিন্দু, অপর চোখে ধীর ম্লান হাসিরেখা।

প্রাণের দেবতা জন্মের মতো বিদায় নিয়ে চলে গেল, রেখে গেল তার জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন একটি নবজাত শিশুসন্তান। বুক যতটুকু খালি হলো, কোল ততটুকু ভরে উঠলো।

সেই একদিনকার রক্তমাংসের পিণ্ডকে নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে মানুষ করে তুলেছেন। এখন সাধ ঐ একান্ত সম্বল গহনাগুলি ব্যাটার বৌকে পরিয়ে নিজের না-মেটা সাধ মেটাবেন। কিন্তু গহনার কথা মনে আসতেই অতীতের অন্ধকার পথ বেয়ে তাঁর দিন চলে যায় পঁচিশ বছর আগেকার এক সর্বনাশা দিনে। আর তাঁর কথা বলা হয় না।

ছেলে অত বোঝে না। মাকে রাগাবার জন্যে বলে

তোমার সেই মান্ধাতার আমলের অনন্ত আর মাকড়ি আজ-কালকার মেয়েরা পরে না।

স্মৃতি-ক্লিষ্ট মায়ের মুখে এবার আর কথা জোগায় না; চুপ করে তিনি অন্য ঘরে চলে যান।

রবীন দু'দিনের ছুটীতে মায়ের কাছে এসেছে। এবার মা গাঁয়ের বাড়ীতে নেই। কোলকাতা থেকে কাছে হবে বলে জেলা সহরে বাসা ভাসা ভাড়া করে রেখে গেছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে উঠে সে বেরিয়ে পড়লো দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

সহরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। দু'তিন বছর আগে যা' ছিল জমজমে, এখন তা' একেবারে ফাঁকা ফাঁকা। পাকিস্তান হবার পর অনেকেই সহর ছেড়ে চলে গেছে, যাচ্ছে। যে সমস্ত তরুণদল সরকারী চাকরী করে সহরে থাকতো, পনেরোই আগষ্টের পর তারা সবাই বদলী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে। তরুণবিরল সহর তাই একেবারে নিষ্প্রাণ। রবীন রাস্তা দিয়ে চলে। চেনামুখ আর সেরকম চোখে পড়ে না। অচেনা নতুনেরা এসে পুরানোর ঠাঁই কেড়ে নিয়েছে।

ভোজ শেষের উচ্ছিষ্ট মাটির পাত্রের মতো যে দু'চারজন বন্ধু সহরে আছে, রবীন তাদের সঙ্গে দ্যাখা করে বিকালটা কাটিয়ে দিল। এ ধরণের বন্ধু মিলনে আনন্দের চেয়ে বেদনার ভাগই থাকে বেশী। যে আছে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে

যারা নেই তাদের কথাই বেশী করে মনে পড়ে। বন্ধুরাও আর অকারণ আলাপনে আনন্দ পায় না। চালের দাম চল্লিশ টাকা, কয়লা মেলে না, কাপড় কল্পনার বস্তু। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকা যাবে কিনা---এই সব কথাই বলে।

ওতে রবীনের মন ভরে ওঠে না। মামুলী আলাপ করে সে বাসার দিকে ফিরে আসে। মায়ের আদেশ—দোকানে চা না খেয়ে বাসায় এসে চা খেতে হবে।

কৈ, মা, চা কৈ ? দোকানে চা খাইনি কিন্তু।

আয় বাবা, এই যে জল চাপাচ্ছি।

দরজার চৌকাট ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে এক পা দিতে না দিতেই সে থমকে দাঁড়ালো। সহসা এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকানিতে তার চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল। একটি অচেনা মেয়ে ধড়্মড়্ করে রবীনের মায়ের পাশ থেকে উঠে ওপাশে গিয়ে বেড়া ঘেঁসে দাঁড়ালো। সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারে মুখখানা ভালো করে দ্যাখা গেল না। তবে মনে হয় তার গায়ের রংটা ফর্সাই হবে।

মায়ের উপর তার রাগ করা উচিত কি খুশী হওয়া উচিত সহসা সে বুঝে উঠতে পারলো না। তার সঙ্কোচভাব দেখে মা সাহস দিয়ে বললেন --কৈ ভিতরে আয়। এই .. জল প্রায় হয়ে গেল।

- না ঘরের মধ্যে বড়ো গরম, আমি বাইরে বসি। রবীন দরজার সামনে একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

ঘরের মধ্যে শোনা যায় একটি অপরিচিত কণ্ঠের মিহি সুরের ফিস্‌ফিসে কথা—আমি যাই এখন।

মা জোরে জোরে তার জবাব দেন—তা' কি হয়? তোমার জল নিয়েছি, চা হয়ে গেল। না খেয়ে যাবে কোথায়। তুমি একটু আসো বলে তবুও দুটো কথা কয়ে হাঁপ ছাড়ি। ও আমাকে দিব্যি একলা রেখে ভারতে গিয়ে বসে আছে।

—আমি এখন যাই। আর বেশী দেরী করলে বাবা রাগ করবেন। সেই মিহি কণ্ঠের ফিস্‌ফিসে আওয়াজ।

—তুই বাইরে বসে রইলি যে? গরম চা আমি বাপু বাইরে নিয়ে যেতে পারবো না। টল্‌কে পড়ে যাবে। কথার রেশ রেখে সুর বদল করে বলেন—ও! রেবাকে দেখে তোর লজ্জা করছে বুঝি? ও আমাদের পাশের বাসার মেয়ে।

রবীন ভারী অস্বস্তি বোধ করলো। কেন এ কারসাজী। জোর করে একটা অচেনা মেয়ের সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া। তার ইচ্ছা হয় মাকে তুড়ে বকে দেয়। কিন্তু মেয়েটা তাতে কী ভাববে ভেবে ইচ্ছাটাকে তার চেপে যেতে হয়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রবীন দেখলো মেয়েটি তার মায়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চায়ের পেয়ালা মুখে ধরে চা খাচ্ছে।

উবু হয়ে বসে রবীন একবার সেদিকে চাইলো। তার মনে হলো মেয়েটির ঘাড়টি যেন তার দিকেই বেঁকে আছে। গম্ভীর-

ভাবে মায়ের হাত থেকে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সে বললো—শুধু চা নাকি মা ?

—কী করি বাপু। তুই সেই বেরুলি, আর এলি সন্ধ্যের সময়। দু'টো মুড়িটুড়ি আনবো তা' আনাই কাকে দিয়ে। আটা-টাটা তো আর মেলে না।

—ভালো। চা ভালো জিনিষ। ক্ষিদেকে ফাঁকি দিতে এর চেয়ে ওস্তাদী দাওয়াই আর নেই।

মেয়েটা ফিক করে হেসে ফেলে রবীনের পাশ দিয়ে বাইরে চলে যেতে লাগলো। হাসির শব্দে চকিত হয়ে সে চেয়ে ছ্যাখে তরুণীটি তার পানে চাইতে চাইতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছ না কি মা ? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

সন্ধ্যের পর বাইরে থাকলে বাবা বাগ করেন। একটু চঞ্চলতার ঢেউ জাগিয়ে কথা বলতে বলতে সে চলে গেল।

চা খাওয়ার পর মায়ে-পোয়ে অনেক কথাবার্তা হতে থাকে। রবীন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে –ও জীবটিকে আমদানি করলে কোথা থেকে ?

— তোর সব কথা বেয়াড়া। মা স্নেহের পর্দায় চড়া আওয়াজ তুলে বলেন- আমি কেন আমদানি করতে যাবো ?

রাগ করো কেন ? বেশ স্নেহের সম্বন্ধও গড়ে উঠেছে দেখছি, তাই বললাম।

ওরা গাঁয়ের বাড়ী ছেড়ে এসেছে। ওর বাবা সরকারী চাকুরে ছিলেন। ওরা ব্রাহ্মণ তা' জানিস্ তো ?

—রক্ষে করো মা, জানার জিনিষ দুনিয়ায় অনেক আছে। পরের জাতের খবর রাখতে আমি ব্যস্ত নই। আর তা' ছাড়া জানো তো জাত-টাত আমি মানি নে। পাকিস্তান হবার পর ব্রাহ্মণ-টাহ্মণ ও সব চুকে গেছে। এখানে এখন সব হিন্দু।

মায়ের মুখে একটা গৌরবফুল্ল হাসি জেগে ওঠে। তার ভাষা যেন তাঁর ছেলেটা পাগল, সে শাস্তর-টাস্তর কিছু জানে না। মুখে বলেন—একাকার হচ্ছে বলে কি ব্রাহ্মণ আর ছোট জাত সমান হতে পারে নাকি ?

ছেলে মায়ের ভাব লক্ষ্য করে জোর করে আর একটু বেশী হেসে বলে—আচ্ছা মা, আমি যদি একটা অব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে করি ?

মায়ের জবাব পাওয়ার আগেই বলে—আমাকে ত্যাগ করে কাশীবাসী হবে তো ? শেষে বিশ্বেশ্বরের দর্শন করতে গিয়ে আমাকে দর্শন করে বসলে কিন্তু আমার দোষ নাই।

— যাক্‌গে বাপু, আমি বলিনি। মায়ের মুখখানি গম্ভীর হয়ে ওঠে.।

— না, না, তুমি বলো। আমি চুপ করে শুনছি।

—কী ছাই বলবো। রেবার কথা জিজ্ঞাসা করলি, তাই বলছিলাম যে মেয়েটা লক্ষ্মী।

—তা কি আমি অস্বীকার করছি ? স্বয়ং লক্ষ্মী না হলেও লক্ষ্মীর অংশ তো বটেই। নিঃশব্দ হাসিতে ছেলের মুখ রাঙিয়ে ওঠে। মা তার মর্ম্মবোধের জন্যে ব্যস্ত হন না।

আগের কথার রেশ টেনে নিয়ে বলেন—আমার তো মেয়ে নেই, ও আসে এখানে···মেয়েটাকে আমার ভালো লাগে···

—পরের মেয়েকে ভালো লেগে লাভ? এই তো বাসা, বাসা করছ, পেলেই তো তোমাকে কোলকাতায় নিয়ে যাবো,—তখন?

এতক্ষণে মা যেন মনের কথাটি খুলে বলার একটা সুযোগ পান—তাইতো বলছিলাম তুই মত করলে রেবার মায়ের কাছে কথাটা পাড়ি। ওর বাবা সংসারের ধার ধারেন না। দিনরাত আহ্নিক নিয়েই আছেন। শেষ বয়সে কী কষ্ট ভদ্দর লোকের। চোখ দু'টো হারিয়েছেন।

মায়ের মুখে সম্ভাবিতা বধূর কথা শুনে রবীনের কানে থেমে যাওয়া গানের সুরের মতো বাজতে থাকে তার চলে যাবার সময়ের কথা ক'টি। চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে সেই ত্রস্ত চাহনি-ভরা দেহের গতিভঙ্গী। মুখখানা ভালো না দেখলেও বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশে তা' সুন্দর হয়ে দ্যাখা দ্যায়। মন জানার চেয়ে মানাতেই খুসী হয়ে ওঠে।

মায়ের পীড়াপীড়িতে রেবার মায়ের কাছে তাঁর প্রস্তাব করার ব্যাপারে একরকম সায় দিয়েই রবীন কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলো।

পাখি উড়ে আনন্দ পায় কিন্তু উড়ে যেতে যেতে যখন পাখায় নামে শ্রান্তি, তখন সে খোঁজে নীড়ের আশ্রয়।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর মেসের একখানি খাটের উপর শুয়ে মনে পড়ে আপন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। মিশেছে অনেকের সঙ্গে, মেলেনি অনেকের সঙ্গেই। হৃদয়ের পান্থশালায় কত অতিথি এলো গেল। সবাই যেন কয়েক রাত্রি প্রবাসের বন্ধু। রইলো না কেউই। তবু সে তো পথ ছাড়েনি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা আর থাকবে না। তারা মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে-- এই বুকভরা আশা নিয়েই তো বর্তমানের বঞ্চনাকে সে উপেক্ষা করতে পেরেছে। দারিদ্র্য-দলিত জীবনে আরও দারিদ্র্যকে বরণ করে আগস্ট আন্দোলনের সময় পুলিশের লাঠিগুলিকে উপেক্ষা করে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিল সেই মরণ-মহোৎসবে। কারাবাস নিভৃত সাধনার দুর্লভ অবসর বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ? তার দেশ পড়েছে পাকিস্তানে। সেখানে সংখ্যালঘুর নাগরিক অধিকারের দাবী পাকা হলো না। যারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছে তারা আজ কাঙ্গালী। যারা মাটি কামড়ে পড়ে আছে তাদের কপালে কী আছে কে জানে?

রবীনের চোখে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে দ্যাখা দ্যায়। দূর আর যাকে হাতছানি দিয়ে সর্বনাশা আনন্দের পথে টেনে নিয়ে যাবে না, ঘরের সুখটুকু তার ছেড়ে লাভ?

সে ভাবে—মন্দ কী, মা আছেন, মনের মত স্ত্রী এলে দু'টি নারীর হৃদয়ের বিচিত্র রসধারায় হয়তো জীবন-মরু

আবার সরস উঠবে। ভেবে দেখলো মায়ের প্রস্তাবে মত দিয়ে সে ভালোই করেছে। ছ'পক্ষের যদি মত হয়, বিয়ে আজই না করলেও ক্ষতি নেই, ছ'চার মাস পরে করলেও চলবে।

রবীন মায়ের কাছে একখানা চিঠি দিল ভাবী বধূর পরিচয় জানবার জন্যে।

সময়মতো মায়ের কাছ থেকে জবাব এলো। মা লিখেছেন—ওরা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেবার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। উনি বললেন, ছোটকালে বোধ হয় তোকে উনি দেখেছেন। সেই যে বন্দবিলায় যেবার স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন উনি তোদের থানার বড়োবাবু ছিলেন। ভারী আলাপী লোক, আর যেরকম ধর্মভীরু তাতে লোক খারাপ বলে মনে হয় না। মেয়ে-জামাইকে তিনি যথাসাধ্য দিতে কসুর করবেন না। ছোট মেয়ে……

রবীন চিঠিখানির এই পর্যন্ত পড়ে থেমে যায়। তার আশা-রঙীন মনের আকাশে কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ ভেসে আসে। শ্রান্ত পাখির পাখা আবার শক্তির বেগে হয় চঞ্চল। সংসারের রসলোলুপ মানুষটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে স্বপ্নসাধক বৈরাগী মূর্তিটি।

রেবা কি তা'হলে গঙ্গাদাস বাবুর মেয়ে? যাঁর অত্যাচারের কাহিনী একদিন বন্দবিলার আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে মুখে ছড়িয়েছিল? না জেনেশুনে এমন একটা প্রস্তাব কেমন করে

মুখে আনতে পারলেন? রাগে, বিরক্তিতে, ঘৃণায় সে মায়ের চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

বৃটিশ-বন্ধুর সঙ্গে বৃটিশ-শত্রুর আত্মীয়তা, অহি-নকুলে মিতালী? অসম্ভব। অসম্ভব শুধু তার দিক থেকেই নয়, পাত্রীর পিতার দিক থেকেও বটে। তার পরিচয় শুনলে গঙ্গাদাস বাবুই বা রাজী হবেন কেন একটা জেল-খাটা ভবঘুরে ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে? না, এমন একটা প্রস্তাব তার কানে তুলে মা তাকে ছোট করে দিয়েছেন।

মা লিখেছেন—তিনি বড়ো ধর্মভীরু। কথাটা মনে হতেই স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে হো-হো করে হেসে উঠলো। সারা জীবন ভরে যারা অকুণ্ঠভাবে অধর্মাচরণ করতে পারে তারাই তো হয় শেষ জীবনে ধর্মভীরু।

আচমকা হাসিতে মেসের বন্ধুরা চমকে উঠে কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সে সত্যমিথ্যা ভাঁজিয়ে একটা জবাব দিয়ে লজ্জায় চুপ করে গেল।

উপুড় হয়ে বালিশের উপর মুখ রেখে শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগলো। বন্দবিলায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় তার জ্ঞান হয়নি। কিন্তু বড়ো হয়ে সে শুনেছে তার গ্রামের লোকদের উপর বিদেশীর অনুগত দেশী ভৃত্যদের নির্লজ্জ অত্যাচারের কাহিনী।

অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় সারা ভারতবর্ষ মাতোয়ারা। ভারত মাতার একটা অবাধ্য ভবঘুরে ছেলে বহুদিন পরে বিদেশ

থেকে ফিরে এসে তার ভাইবোনদের কানে কানে কী শুনিয়ে দিল, আর আসমুদ্রহিমাচল নেচে উঠলো তার কথায়। তারা মরণপণ করে মেতে উঠলো বন্দিনী মায়ের শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলনে। সহায় বিধাতার অমোঘ অস্ত্র—অহিংস অসহযোগ।

সেই জাগরণের আলোক-রাঙা দিনে নব-সূর্যের স্বর্ণরশ্মির একটা পথভোলা ঢেউ কালক্রমে তাদের দূর পল্লীর আঙিনায় এসে পৌঁছে সেখানকার পল্লীবাসীদের কানে কানে শুনিয়ে দিয়েছিল ঘুম-ভাঙানো গান।

অসহযোগ রূপ নিল ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে। স্থানীয় একজন নেতার অঙ্গুলী নির্দেশে মেতে উঠলো গ্রামবাসীরা, পণ করলো তারা ট্যাক্স দেবে না।

আন্দোলনের সংহতি নষ্ট করবার জন্য সরকারী কূটনীতি ব্যর্থ হয়ে গেল। তারপর এলো কঠোর দমননীতি। অপমান, অত্যাচারের নির্লজ্জ অভিযান। ছোটবড়ো নির্বিশেষে নির্যাতন। বধূকে বিবস্ত্রা করে শালীনতা হানি, মায়ের কোল থেকে তার বুক-চেরা ধন ছিনিয়ে নিয়ে দোতলার উপর থেকে নীচে ফেলে দেওয়া।

বিদেশীর আইনে দমননীতি প্রয়োগের বিধি ছিল ঠিক, কিন্তু অত্যাচারের তো পদ্ধতি বা মাত্রা বাঁধা ছিল না। অত্যাচার তো করেছে দেশী লোকেরাই। অতখানি নিষ্ঠুর তারা না হলেও তো পারতো। কেমন করে দেশের লোক হয়ে তারা পারলো!

না-না-না, তা' হতে পারে না। মায়ের প্রস্তাবিত পক্ষকে ভালো করে না জেনে মত দিয়ে রবীন যেন নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছে। রেবার প্রতি তার এমনি কোনো বিদ্বেষের কারণ নেই। সে হয়তো সুন্দরী হতে পারে। কিন্তু তার দেহে রয়েছে তো সেই অত্যাচারীর রক্ত। রক্তের আকুতি যদি তার সন্তানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বসে ?

মা লিখেছেন, রেবার বাবা অন্ধ। হ্যাঁ, হয়েছে। বন্দবিলার আন্দোলনের সময় হয়তো তিনি কোনো নারীর উপর অত্যাচার করেছিলেন, আর না হয় কোনো নারীকে অত্যাচারিতা হতে দেখেও তার প্রতিকার করেননি। তাই সেই সতী নারীর অভিশাপে তাঁর চোখ দু'টি অন্ধ হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সেই গোধূলির আলো-ছায়ার আড়াল দিয়ে পালিয়ে-যাওয়া ক্ষণিক-দেখা তরুণীর ছায়ামূর্তি যেন সমস্ত মাধুরী হারিয়ে নাগিনীর ক্রূরমূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়ালো।

না, বিয়ে আর সে করবে না। যে জীবন কোনোদিন স্বপ্নে ঠাঁই পায়নি, তাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রথম প্রয়াসেই হলো এমনিতরো ছন্দোপতন !

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর মেসের কোলাহল নীরব হয়ে এলো। সে চাকরকে দিয়ে বাইরের দোকান থেকে একটা বাতি কিনে আনিয়ে গেল ছাদের উপরে। তার মাথাটা দুশ্চিন্তায় টন্‌টন্ করছে।

ছাদে এসে খানিকক্ষণ সে বাইরের হাওয়ায় পায়চারী করে বেড়ালো। বহুদিন তারা-ভরা আকাশ এমনি করে একা দেখার সুযোগ হয়নি। আজ প্রাণ ভরে সে চেয়ে রইলো সেই দিকে। স্বপ্নাবেশ-ভরা চোখের সুমুখ থেকে আকাশের আর সমস্ত তারার অস্তিত্ব মুছে গেল ; জেগে রইলো শুধু সপ্তর্ষি,—বহুযুগের বিস্ময় দিয়ে আঁকা একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। সপ্তর্ষির তারাগুলো তার পানে চেয়ে হাসতে লাগলো।

বাতিটা জ্বালিয়ে তার ম্লান আলোয় বসে সে মায়ের কাছে একখানা কড়া চিঠি লিখে ফেললো। যে পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন তার বেশী যেন আর অগ্রসর না হন। আর সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে যেন বলেন তাঁর ছেলে এ বিয়েতে রাজী নয়। তবে মেয়ে সৎপাত্রস্থা হয়েছে জানলে সে সুখী হবে।

চিঠি শেষ করে রবীনের মনে হলো সব যেন লেখা হয়নি : আর একবার চিঠিখানি পড়ে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখলো—হ্যাঁ, আর ঐ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে যদি অন্য কোনো ভাবে আমার সাহায্য কাজে লাগে, তবে আমি তাতে কুণ্ঠিত হবো না।

# পত্র প্রেম

সন্তোষ-স্মৃতি গল্প প্রতিযোগিতার সংবাদ প্রকাশিত হবার পর তরুণ লেখক মহলে বেশ সাড়া পড়ে গেল। প্রথম পুরস্কার এক হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ শ' টাকা। তবে টাকাটাই একমাত্র কথা নয়। পুরস্কার-পাওয়া গল্প দু'টি বাংলার যে কোনো একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হবে। তা' ছাড়া কর্তৃপক্ষ গল্প দু'টির ইংরাজীতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং এমন সুযোগের অংশভাক্ হতে কোন্ তরুণ লেখকের মনে না ইচ্ছা হয়?

অন্যান্য তরুণ লেখকের মতো যতীশ করের মনও তাই সঙ্কোচে ও আনন্দে তোলপাড় হতে লাগলো। কিন্তু পুরস্কার পাওয়া তো কম কথা নয়। বহুর মধ্যে বিশিষ্ট হওয়া। অথচ একটি রসোত্তীর্ণ গল্প লেখাই কি সোজা ব্যাপার? কাহিনীর সঙ্গে আঙ্গিক ও ভাষার সার্থক সংযোগ হলে তবেই গল্প রসোত্তীর্ণতা অর্জন করতে পারে। আর গল্প রসোত্তীর্ণ হলেও পুরস্কারযোগ্য হবে না যদি না আরও অনেক, রসোত্তীর্ণ গল্পের মধ্যে কোনো না কোনো দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

আজ ক'দিন ধরে চেষ্টা করেও যতীশ কর ভালো একটা প্লট মাথায় আনতে পারলো না। প্লট যা' মনে আসে প্রাথমিক বিচারেই তা' বাতিল হয়ে যায়। প্রতিযোগিতার ব্যাপার কি না। যতীশ বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সহসা তার মনে পড়ে গেল অমর চাটুজ্যের কথা। লোকটা লিখতে পারুক না পারুক প্লটের রাজা। ভগবান ওকে গল্পকারের হাত ও সাধকের নিষ্ঠা দেননি নইলে লোকটির লেখক হিসাবে নাম করতে বাধা ছিল না। যতীশ তো ওর মুখে শোনা কয়েকটি গল্পকে প্লট হিসাবে ব্যবহার করে দেখেছে। সে গল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এবং পড়ে দু'চার জন ভালোও বলেছে। সে ভাবলো এবারও চাটুজ্যে মশায়ের শরণ নিলে মন্দ হয় না।

চাটুয্যে মশায় এই পাড়ার বাসিন্দা। শুধু বাসিন্দা নয়, একখানি দোতলা বাড়ীর মালিক। ভদ্রলোক নিঃসন্তান, সুতরাং নির্ঝঞ্ঝাট। বাড়ী ভাড়ার আয় থেকেই চলে যায় স্বামী-স্ত্রীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। ওঁর কাজের মধ্যে ঘন ঘন গড়গড়ায় নল লাগিয়ে তামাক খাওয়া আর পাড়ার ছেলে-বুড়োর সঙ্গে সুযোগ পেলে গল্প গুজব করা।

এই পাড়ায় বাসা করে আসবার পর যতীশের সঙ্গে অমর চাটুয্যে নিজেই এসে আলাপ-পরিচয় করেন। কর-পরিবারের ছোট ছেলে গল্পটল্প লেখে শুনে চাটুয্যে মশায় নিজেই একদিন এসে হাজির। একদা তরুণ যৌবনে তিনিও কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি সেই সময়কার মাসিকপত্রে

ছাপাও হয়েছিল। সেই মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে দু'খানি এখনও তাঁর কাছে আছে। সেই পত্রিকা দু'খানি হাতে করে এসেই তিনি যতীশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

আর পাঁচজন বাঙালী যুবকের যা' হয় চাটুয্যে মশায়েরও তাই হয়েছিল। বাস্তব জীবনের কাঠিন্যের স্পর্শে কবে তাঁর জীবনের সাহিত্যিক স্বপ্নটুকু মুছে গেল তিনি নিজেই তা' টের পেলেন না। এইভাবে যৌবন পার হয়ে আজ তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত। তাই বলে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ নেই। একদিন গল্প লিখতেন—একথা বলতেও যেমন তাঁর সঙ্কোচ বোধ হয় না, আজ গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছেন তা' বলতেও তেমনি সঙ্কোচ নেই। এ যেন অতি সহজ ও সাধারণ ঘটনা। জীবনে যৌবন আসে, কিন্তু সে আপন নিয়মে চলে যায়। তাকে ধরে রাখতে না পারার জন্যে যেমন কেউ লজ্জিত হয় না, তেমনি যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সাহিত্য সৃষ্টির ঝোঁক এসে আবার চলে যায় তাতেই বা লজ্জার কী ?

উভয়ে উভয়ের গল্প পড়ে তারিফ করার ভিতর দিয়ে যতীশ কর ও অমর চাটুয্যে—পরস্পরের মধ্যে সহজেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। চাটুয্যে মশায় প্রথম দিনেই অভয় দিয়ে বলেছিলেন – লেখো ভায়া, তোমার হাত আছে। দরকার হলে আমি তোমাকে অনেক গল্পের খোরাক জোগাতে পারবো। ..বয়সের অনুপাত নির্বিশেষে পাড়ার ছেলেরা চাটুয্যে মশায়কে দাদু বলে ডাকতো। যতীশও সেই সুবাদে তাঁকে দাদু বলে ডাকা শুরু

করলো। ফলে, উভয়ের মধ্যে ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হয়ে, গেল।

যতীশ ভেবেছিল নিজেই গিয়ে চাটুয্যে মশায়ের শরণ নেবে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। তিনি নিজেই এসে ধরা দিলেন। সেদিন যতীশের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—ভায়া প্রতিযোগিতায় একটা গল্প পাঠাচ্ছ তো?

যতীশ হেসে বললো—ইচ্ছা তো আছে কিন্তু কিছুতেই একটা ভালো প্লট মাথায় আসছে না। কী করি বলুন তো?

—তুর্গার নাম করে লেগে যাও। দেখি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কি না। আত্মগত হাসিতে চাটুয্যে মশায়ের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কথা দিয়ে অমর চাটুয্যে মুস্কিলে পড়লেন। একে একে অনেক প্লট তাঁর মাথায় আসতে লাগলো। কিন্তু কোনোটাকেই ঠিক প্রতিযোগিতায় পাঠাবার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। অথচ তরুণ লেখককে একটা প্লট না দিতে পারলেই বা তাঁর মান থাকে কোথায়। তাঁর দেওয়া প্লটে লেখা গল্প যদি পুরস্কার পায় হয়তো লোকে তাঁর নাম জানবে না। না-ই বা জানলো। যে পুরস্কার পাবে সেই লেখকের কাছে তো তাঁর স্বীকৃতি থাকবে। জীবনে নামটাই তো সব নয়। মর্যাদার জন্যেই নামের প্রয়োজন। সে মর্যাদা তো বিনা নামেও আসতে পারে।

নানা এলোমেলো চিন্তা মাথায় আসতে থাকে। এইভাবে সহসা তিনি যেন সমাধানের পথের একটা ইঙ্গিত পেলেন। হ্যাঁ,

হয়েছে। একটা ভালো প্লট বোধ হয় তিনি দিতে পারবেন। সেটা এখনও পর্যন্ত কাউকে গল্পচ্ছলে শোনানো হয়নি। ইচ্ছা ছিল নিজেই তিনি একটা গল্প' লিখবেন। কিন্তু তা' আর হয়ে ওঠেনি। প্লটটা অবশ্য গোছালো নয় তবে কল্পনা মেশালে গুছিয়ে নিতে কোনো লেখকেরই বাধবে না। যতীশ পারতে পারে। ওর গল্পের বাঁধুনি ভালো।

চাটুয্যে মশায়ের শোবার ঘরের তাকের উপর নানা দলিল-পত্রে ভরা একটা স্যুটকেশ ছিল। এই স্যুটকেশের চাবিটি সব সময় তাঁর নিজের কাছে থাকতো। মূল্যবান কাগজপত্র রয়েছে; অন্যে হাতে দিলে পাছে কোনো কাগজপত্র হারিয়ে যায়, তাই তিনি স্ত্রীর কাছে পর্যন্ত ওর চাবি দিতেন না। সেদিন দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম না করে তিনি সেই স্যুটকেশটি নীচে নামিয়ে খুললেন। তারপর অনেক কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করে একখানি বড়ো খামের ভিতর থেকে ক্লিপ দিয়ে আঁটা কয়েকখানি জরাজীর্ণ কাগজ বের করে বিছানার নীচে রাখলেন।

বিকেল বেলা যতীশ যখন অফিস থেকে ফিরে আসছিল, চাটুয্যে মশায় তার সঙ্গে দেখা করে বললেন —ভায়া, সন্ধ্যার পর সময় কোরো। প্লট পেয়েছি। লিখতে পারলে মনে হয় নতুন ধরণের একটা গল্প হবে।

যতীশ হেসে বললো—ঠিক আছে। যদি প্রথম পুরস্কার পাই, তা' হলে অর্ধেক আপনার, অর্ধেক আমার। কেমন তো?

চাটুয্যে মশায় গম্ভীর হয়ে বললেন—না ভায়া, টাকায় আমার দরকার নেই। কথা রাখতে পারলেই আমার যথেষ্ট।

সন্ধ্যার পর যতীশ এসে চাটুয্যে মশায়কে ডেকে নিয়ে গেল ওদের বাসায়। কথায় কথায় তিনি বললেন—গ্যাখো ভায়া, এবার একটা লেখা প্লট শোনাবো। হয়তো ভাষার দিক থেকেও কিছু সাহায্য পাবে।

—দিন।

না, না, দিলে হবে না। আমি পড়ে শোনাবো। অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। আমার আগে পড়া আছে কি না। মাঝে মাঝে দু' চারটে শব্দ পড়া না গেলেও আমি জুড়ে জুড়ে পড়ে যেতে পারবো।

—আচ্ছা, তবে আপনিই পড়ুন।

একটু ভূমিকা করে চাটুয্যে মশায় বললেন—গ্যাখো, প্লটটা চিঠির আকারে লেখা। মনে করো এক পক্ষের লেখা সাতখানি চিঠি শুনছ। এইগুলি শুনতে শুনতে কিন্তু অপর পক্ষের মনের ভাবটা কল্পনা করে নিতে হবে। তা' হলেই পুরো একটা কাহিনী গড়ে উঠবে। মানে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস কি না। পড়ে ভালো লেগেছিল বলে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। তা' তুমি সাহিত্যিক, কল্পনা দিয়ে বাস্তবের ক্ষতিপূরণ করতে তোমার আটকাবে না।

যতীশ মৃদু হেসে মুখ নীচু করলো। চারিদিকে চেয়ে দেখে চাটুয্যে মশায় পড়া শুরু করলেন।

......আমার চিঠি পেয়ে অবাক হবেন, তা' জানি। হয়তো

ভাববেন অনেক পুরুষের সঙ্গে মিশে মিশে বীণা কী প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছে। নইলে সাত চড়েও যে রা কাড়তো না, সে এত নিঃসঙ্কোচে এমন চিঠি লিখতে পারলো কেমন করে? ভাবুন আপনার যা' ইচ্ছা। পুরুষেরা ময়েদের সম্বন্ধে এমনি একতরফা বিচার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে। কিন্তু আমি ভেবে ভেবে আর পারছি না, তাই সেই ভাবনার কিছু অন্ততঃ ভাষায় প্রকাশ করে আপনার মনে দুর্ভাবনা জাগিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চাই। ...আপনিতো মনস্তত্ত্বের ছাত্র বলে গর্ব প্রকাশ করতেন। তা' হলে আমার মনোভাব তো আপনার জানা জিনিস। আর তাই যদি হয় তো জানা জিনিস জানবার জন্যে অমন পীড়াপীড়ি করেন কেন? তা' হলে কি জ্ঞানের মধ্যে আপনার সংশয় আছে? ভাষাটা বোধ হয় ছাত্রীর মতো হলো না, তাই না? ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনিই কি আমাকে নিছক পাঁচ বছরের পুরানো ছাত্রীর মতোই দ্যাখেন। ...যাক্, ধরা যখন পড়েই গেছি, পালিয়ে না-ই বা গেলাম। ভেবেছিলাম দূর থেকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে যাবো। নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে অনর্থক একটা সমস্যার সৃষ্টি করবো না। কিন্তু আপনি সে সুযোগ দিলেন কই? যদি আশ্বাস দিয়ে কথা রাখতে না পারি, তাই ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে ছিলাম। আপনি আজ সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছেন। আমার ভিতরকার ঘুমন্ত মানুষটি জেগে উঠে আমাকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে।... জানি না, এর পরিণতি কোথায়! আচ্ছা, আপনি একদিন বলেছিলেন যে,

সত্যের উপর বিশ্বাস রেখে কোনো কাজ করলে একদিন না একদিন সফলতা আসবেই। কিন্তু কই, সফলতা তো আসছেই না বরং যা' আশা করেছিলাম সব তলিয়ে গেল। যাক্, আপাততঃ বলি, আমাদের বাড়ী আসবেন কিন্তু। আপনার সাহায্য না পেলে কিন্তু এবার পাশ করতে পারবো না। দাদার হাবভাব দেখে মনে হয় সে এখন আমার পুরুষের কাছে পড়া ঠিক পছন্দ করে না। তবে আপনার কথা আলাদা। আপনি অনেক দিনের মাস্টার। ...এটা পড়ে হয়তো ব্যথা পাবেন কিন্তু বিশ্বাস করুন এগুলি আমার মনের কথা। চিলে কোঠায় বসে তাড়াতাড়ি লিখতে হচ্ছে। তাই এখানেই ইতি করলাম। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম রইলো। হ্যাঁ, আর একটা অনুরোধ। আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন। ইতি--

প্রথম চিঠিখানি পড়া শেষ হলে চাটুয্যে মশায় চশমা উঁচু করে যতীশ করের মুখের দিকে চাইলেন। প্লট লেখকের মনে সাড়া জাগাতে পেরেছে কি না একবার যাচাই করে দেখবার ইচ্ছা। কিন্তু শ্রোতার চোখে মুখে কোনো রকমের ভাবান্তর না দেখে তাঁর মনে ঈষৎ নৈরাশ্য বোধের সঞ্চার হলো। সে মনোভাব গোপন রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন, চলবে তো? ভাষা ও কথার বাঁধুনি নেহাৎ মন্দ নয়। মানে, আমার ভালোই লেগেছে।

যতীশ বললো এক্ষুনি কি মন্তব্য করা যায়? আরও দু'একখানা পড়ুন।

৫ চাটুয্যে মশায় দ্বিতীয় পত্রখানি পড়া শুরু করলেন।

……আমাকে এমন সুন্দরভাবে কল্পনা করেছেন যা' ভাবতেও আমার গর্ববোধ হয়। আগের চিঠির ভাষা হয়তো একটু রূঢ় হয়েছে। মনে কিছু করবেন না। সহসা বাবার মৃত্যুতে আমি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছি। আমার মন ও মুখ দুই-ই এলোমেলো হয়ে গেছে। সর্বদা মনে হয় আপন বলতে এ দুনিয়ায় আমার আর কেউ রইলো না। ……দেখুন,' আপনাকে ভালো লেগেছিল আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই। মনে হতো আপনি অনেক দূরের মানুষ। আমার নাগালের একান্ত বাইরে। তাই ভক্ত উপাসিকার মতো দূরে দাঁড়িয়েই আপনার উদ্দেশ্যে মনে মনে অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছি। আমার আশেপাশে যারা হ্যাংলার মতো ঘোরে, আমি তাদের চিনি। পুরুষদের চিনতে মেয়েদের একটুও ভুল হয় না। ওটা আমাদের সহজাত শক্তি। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করা সত্ত্বেও যারা অতৃপ্তি নিয়ে নূতনের পিছনে ঘুরে বেড়ায় তারা আমাদের কৃপার পাত্র। ……হয়তো আপনি বলবেন তবে আমি অমুক অমুক বাবুর সঙ্গে মেলামেশা করতে আপত্তি করিনি কেন? ……দেখুন মেশা এক, মেলা আর। মিশেছি ঠিক, মিলিনি কখনই। পুরুষকে বোকা বানাতে পারলে কোন্ মেয়ে না আনন্দ পায়? …এসব কথা আপনি বলতে সাহস দিয়েছেন বলেই আজ বলতে পারছি। তা' বলে আপনি ভয় পাবেন না যেন। বিশ্বাস করুন, আপনার সংযত আচরণের জন্যেই

আপনাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছি। আর দেখুন, জীবনে আমি সবচেয়ে ভালবাসা পেয়েছি বাবার কাছ থেকে। বাবার হাবভাবের সঙ্গে আপনার যেন কোথাও অদ্ভুত মিল আছে।······ আপনি ভেবে দেখতে বলেছেন। বেশী ভাববার এখন সময় নেই। আমি গায়িকা কিন্তু আপনি গান ভালবাসেন। সবাই যে গায়ক হবে তার কোনো মানে নেই···ভয় নেই, আমি শীর্ণ দেহই পছন্দ করি। ডিগ্রীধারিণী হতে চলেছি নামেই কিন্তু কী-ই বা জানি। আমার লক্ষ্য যশোলাভ। সেদিক থেকে আপনার পথই তো শ্রেষ্ঠ। আপনি সমস্যা সমাধানের কথা লিখেছেন কিন্তু লজ্জায় আমার গলা আটকে ধরে। লক্ষ্য করে দেখবেন পিসীমা আমাকে কখনও একা রাখেন না। অথচ উনি বোঝেন না যে দেহটাকে পাহারা দিয়ে রাখলেও মনটাকে বাঁধা যায় না। ······আপনি লোক-ভয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের পরিণতি দেখবার জন্যে। ······পড়াশুনার ক্ষতি, সে তো হবেই। নানা চিন্তায় মন ছেয়ে আছে। আপনি আপনার ছন্নছাড়া জীবন ফুলে-ফলে ভরে দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু পারবো কি না কে জানে! আর একটা কথা। আপনি মন জয় করে নিজেকে আমার সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নিতে পারবেন জানলে কিছুতেই ধরা দিতাম না। আপনি লিখেছেন যে না পেলে জীবনে আমার সঙ্গে দ্যাখা হওয়ার পথ নিজেই বন্ধ করবেন। এটা কিন্তু লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হবে। আপনি

মাঝে মাঝে না এলে আমি মুষড়ে পড়বো। তবে হ্যাঁ, বাড়ীর লোকেরা যেন আমাদের ব্যবহারে গলদ ধরতে না পারে।······ ছ্যাখা যাক্। একদিকে নীরব ভালবাসা, অন্যদিকে মুখর স্নেহ; শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা বরণ করবো কে জানে! যাক্, আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। হ্যাঁ, একটা কথা। আমার আগেকার চিঠিতে দুটো বানান ভুল ছিল লিখেছেন। সেজন্যে আমি লজ্জিত। এবার কিছু ভুল থাকলে শুধরে দেবেন কিন্তু। আর দেখুন, আমি স্বামী বিবেকানন্দের 'আওয়ার উইমেন' বইখানা পড়েছি। ইংরিজিটা সব বুঝতে পারিনি। একদিন বুঝিয়ে দিতে হবে কিন্তু। ইতি—

এখানি পড়া শেষ হলে চাটুয্যে মশায় চশমাটি খুলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন—কিছু বলবে না কি?

যতীশ বললো—এখনও না। আপনি পড়ে যান।

—দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই। এখন তো বুড়োর দলে। একসঙ্গে বেশী পড়লে হাঁপ ধরে ওঠে। বলতে বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

প্রৌঢ়ের কথাটি কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হলো যতীশের কাছে। সে জানে উনি কথা বলতে বসলে একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যেতে পারেন। সুতরাং দশ-পনের মিনিট ধরে একটি লেখা পড়তে তাঁর ক্লান্তি আসে কেমন করে! তবু সে বাধা না দিয়ে চুপ করে বসে রইল। চাটুয্যে মশায় মিনিট পাঁচেক ধরে হাতের কাগজগুলি নাড়াচাড়া করে তৃতীয় পত্রখানি পড়া শুরু করলেন।

……তোমার বক্তব্য পড়লাম। এযুগের মেয়েদের উপর আমারও শ্রদ্ধা কম, কারণ তারা টাকাই চায়। টাকা পেলেই ভালোবাসা দিতে পারে। যেমন আমার বুলুদি। …যাক্, এখন আমার দুর্ভাবনা যে যদি অন্য সংসারে যেতে হয় তবে আমি পাগল হয়ে যাবো। কেন জানো? আমার মনের মাঝে অফুরন্ত প্রশ্ন। সে প্রশ্নের জবাব তুমি ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। এই জিজ্ঞাসা হয়তো আমাকে একদিন পাগল করে দেবে। অবশ্য এই জানবার আগ্রহ তোমার প্রেরণায় পেয়েছি। তুমি আমার জীবনে না এলে আমাকে হয়তো সারা জীবন আধ-ফোটা কুঁড়ির মতন থাকতে হতো। কী মনে হয় জানো? আমার ভিতর যেন কিছু আছে। আমি একা তার সন্ধান পাচ্ছি না। তুমি লেখক, তোমার অলৌকিক শক্তি হয়তো আমার মাঝ থেকে এ সব বার করতে পারবে। ……তুমি আমাকে সাময়িকভাবে ভুলতে বলেছ, তা' কি করে সম্ভব? বই খুলে একলা বসলে তোমার কথা মনে পড়ে আর তার সঙ্গে নানা কল্পনা এসে মন ছেয়ে ফেলে। ভুলতে গেলে আরও বেশী করে মনে পড়ে। যাক্, আমাকে পাশ করানোর ভার তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। ……'তুমি' বলে লিখতে বলেছ তাই লিখলাম। তবে প্রথম প্রথম বাধো-বাধো ঠেকেছে। পাঁচ বছর ধরে 'আপনি' বলা অভ্যাস। ……গানটিতে সুর দিয়েছি। শোনাবো একদিন…… আর একটা কথা। আমাকে গড়ে নিতে হবে কিন্তু। যা' যা' চাও তা' যদি আমার ভিতর না পাও, তবে হতাশ হলে চলবে না।

গড়ে নিলে আমি ঠিক চলতে পারবো······ছাখো, আমার রাগটা একটু বেশী ; তবে বেশীক্ষণ থাকে না। এটা সহ্য করতে হবে কিন্তু। আর একটা কথা খুব সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছি। লাভ্ ম্যারেজ নাকি সুখের হয় না। অবশ্য এ আমার বিশ্বাস নয়, শোনা কথা। আচ্ছা, আমাদের বেলায় এ রকম হবে না তো ? বুঝিয়ে দেবে কিন্তু। যাক্, পরীক্ষার পরই প্রস্তাব কোরো। আমি মনকে যত শক্ত করতে যাই তত অসহায় হয়ে পড়ি। প্রণাম জানিয়ে আজকের মতো শেষ করলাম। ইতি—

—কেমন লাগছে ? কাঁচা হাতের লেখা হলেও বোধ হয় ভাষাটা মন্দ নয়, তাই না ? পড়া শেষ করে চাটুজ্যে মশায় প্রশ্ন করলেন।

যতীশ গম্ভীর স্বরে বললো—এ লেখা কাঁচা হোক্, আর পাকা হোক্, যে চিঠির এ উত্তর সে চিঠি যে পাকা হাতের লেখা ছিল, আপাততঃ সেইটা অনুমান করতে পারছি।

—তাই না কি ? তা'হলে বোধ হয় গল্প ভালোই ওতরাবে, কী বলো ? প্রচ্ছন্ন হাসির আভায় চাটুয্যে মশায়ের মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠলো। তিনি সময় নষ্ট না করে নতুন উদ্যমে চতুর্থ পত্রখানি পড়া শুরু করলেন।

·······পত্রের উত্তরের জন্য মন ব্যাকুল হয়েছিল। তুমি দিতেও চেষ্টা করেছিলে কিন্তু আমি নিতে পারলাম না। উঃ ! আমার যে কী অবস্থা তা' কল্পনা করা যায় না। আমার বিয়ের জন্যে এরা উঠে পড়ে লেগেছে। মানসিক অবস্থা এত খারাপ যে

পড়াশুনায় কিছুতেই মন বসে না। আর মন তো তুমিই নিয়েছ। তুমি আমার পরীক্ষার পরে কি আগে প্রস্তাব করবে ভালো করে ভেবেচিন্তে আমাকে জানিয়ো।......আমি সব সময় ভাবি তোমাকে নির্লজ্জ হতে দেবো না, সব উপেক্ষা করে আমিই বলবো। কিন্তু পারলাম কই? ...... দ্যাখো, আমি একজনকে হাত দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন আমার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। এ সমস্ত আমি মানি (হেসো না)। এই গ্রহের ফেরে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে? একটা সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করতে গেলে সত্যি অনেক শক্তির দরকার। অবশ্য যদি আমাদের অনেক টাকা থাকতো তবে কেউ উপেক্ষা করতে পারতো না। সবাই হেসে মত দিতেন। কিন্তু টাকা আমি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখি না।...... হ্যাঁ, আর একটা কথা। তুমি রাত্রে আর ট্যুইশনি করবে না। অত খাটুনিতে শরীর ভেঙে পড়তে পারে। তোমরা অল্প লোক। অত খাটুনির দরকার কী? নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। এখন কিন্তু অনেক কিছু অধিকার রাখি। প্রণাম নিয়ো। ইতি--

চাটুয্যে মশায় চশমাটা উঁচু করে যতীশের মুখের দিকে চাইলেন।

যতীশ বললো—ঠিক আছে, পড়ে যান। তিনি চশমাটা পরতে পরতে একটু ভূমিকা করে বললেন—এই চিঠিখানা মন দিয়ে শুনো। প্লটের ক্লাইম্যাক্স বোধ হয় এইটাতেই পাবে।

……তোমার চিঠি পড়লাম। প্রেমের ধারণা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি এক মত। আজকাল ছেলে-মেয়েরা কথায় কথায় প্রেম করে। সাময়িক উত্তেজনায় এ ওর চোখে ভালো লাগে, অমনি প্রেম। কিন্তু কিছুদিন পরে অর্থাৎ যখন তাদের একটা ছেলে বা মেয়ে হয় তখনই স্বরূপ প্রকাশ পায়। এত সুন্দর জিনিসটাকে লোকে একেবারে খেলো করে দিয়েছে। …এই জন্যেই তোমার কাছে এতদিন ধরা দিইনি। এই পাঁচ বছরে তুমি আমাকে ভালোভাবে বুঝেছ, আমি তোমাকে জেনেছি। আমার যতদূর মনে হয় আমাদের এ প্রেম ব্যর্থ হবে না। …তুমি অতীতের সেই হারানো দিনের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছ। সত্যি সেই মধুর দিনগুলির কথা মনে পড়লে এত আনন্দ হয়। তোমার সঙ্গে যেদিন চাক্ষুষ পরিচয় হয়, কী ভাবে কার সঙ্গে এসেছিলে, কী পরে এসেছিলে সব মনে আছে। আচ্ছা, তোমার সেই নীল দাগ-কাটা জামাটা তো আর কোনোদিন পরতে দেখিনি। যেদিন তুমি আমার Memory কম বলে বকেছিলে, সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। সত্যি, তুমি যা' আগের দিন পড়িয়ে গিয়েছিলে আমি তা' ভুলে গিয়েছিলাম। Memory কম বলে নয়; তুমি যখন কথা বলছিলে তখন তোমার কথা না শুনে তোমার কথা বলার ভঙ্গীটিই লক্ষ্য করেছিলাম। …আর তোমাকে দেখলে হারমোনিয়ম নিয়ে পালাতাম? সত্যিই আমি লজ্জা পেতাম, কারণ পড়বার সময় গান করা তো উচিত নয়। মনে ভাবতাম তুমি পছন্দ করো কি না। তখন তো সবেমাত্র

চাক্ষুষ পরিচয়। ...আচ্ছা, যে দিনগুলি হারিয়ে যায়, সমস্ত কিছুর বিনিময়ে মুহূর্তের জন্যও কি তাদের ফিরিয়ে আনা যায় না? সমস্ত কিছু হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই হারানোতেই বোধ হয় মানুষের সব চেয়ে ক্ষতি। তাই না? ...তুমি জিজ্ঞাসা করেছ সুযোগ পেলে যদি সদ্ব্যবহার করো, আমার তাতে আপত্তি আছে কি না। কিন্তু ছ্যাখো, সুযোগ আমরা পাবো না। তা' ছাড়া আমার মন চায় না যে আগে থেকে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়। মনে করো তো, হিন্দুর বিয়ের ফুলশয্যার রাত্রির কথা। তার চেয়ে এসো আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে জীবনের ঐ শ্রেষ্ঠ দিনটিকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবো না। কেমন? ...ছ্যাখো তোমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। তুমি সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। অথচ সংসার তোমাকে করতেই হবে,-- তা' আমাকে নিয়েই হোক্ আর অন্য মেয়েকে নিয়েই হোক্। সত্যি, তোমার ওরকম ছন্নছাড়া জীবন আমার ভালো লাগে না।

এই পর্যন্ত পড়তে পড়তে চাটুয্যে মশায়ের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল টপ্ করে হাতের কাগজের উপর পড়লো। চাটুয্যে মশায় কেমন যেন বিব্রত হয়ে চশমাটি খুলে যতীশের দিকে চেয়ে বললেন এই ছ্যাখো, চোখ দু'টো এইবার যাবে আর কী। বেশীক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে চেয়ে কিছু পড়লেই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বয়সের দোষ আর কী। ঠিক আছে, তোমার ফিলিং ডিসটার্ব করবো না। পড়ে যাই, শোনো। চোখটা মুছে তিনি আবার শুরু করলেন।

……তোমার চিঠিগুলো বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। কিন্তু রাখতে ভয় হয় বলে ছিঁড়ে ফেলতে হয়। এ যে কত দুঃখের কী আর বলবো। তুমিও কি আমার চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেল? পারো তো রেখে দিয়ো। পরে পড়ে হাসাহাসি করা যাবে। …একটা মেয়ে পড়ানোর ট্যুইশনি পেয়েছ। নেবে কি নেবে না জিজ্ঞাসা করেছ। তুমি স্বচ্ছন্দে নিতে পারো। তা' হলে এক কাজ কোরো। রাত্রের ছেলে পড়ানো ট্যুইশনিটা ছেড়ে দিয়ো। আমার মনে হয়, ছেলে পড়ানোর চেয়ে মেয়ে পড়ানোর কাজে খাটুনি কম। …সত্যিই ধরা দিতে দেরী হয়ে গেল। ভেবেছিলাম বি. এ. পাশ করে জানাবো। কারণ এর আগে সংসার ঘাড়ে পড়লে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পণ্ড হয়ে যাবে। তা' ছাড়া আমার যা' স্বাস্থ্য, মা হতেও বেশী দেরী লাগবে না (হেসো না কিন্তু)। এও একটা কারণ যে জন্যে ধরা দিইনি। …বাবা এভাবে সহসা ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ায় আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন বন্ধুর মতো। তাঁকে সব অকপটে বলতে পারতাম। যাক্, সবই আমার অদৃষ্ট। দেখি লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে এবার বলতে পারি কি না। …আচ্ছা, ও কথা লিখলে কেন? সংসারে ঝগড়াঝাটি হয়ই। তাই বলে কি তা' অপরকে বলে তোমাকে ছোট করতে পারি? উপরের দিকে থুথু ফেললে কি নিজের গায়েই লাগবে না? …দ্যাখো, আজ সকাল থেকে বার বার তোমার কথা মনে পড়ছে। সকালবেলা থেকেই আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে। রেডিয়োতে তখন বর্ষার গান বাজছিল। ঐ যে

রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটা; যেটাতে এই দুটো লাইন আছে—
'যে গিয়েছে দেখার বাইরে, আছি তারি উদ্দেশ্যে চাহিরে।'
এই দু'টো লাইন শুনছিলাম আর মনে হচ্ছিল 'গিয়েছে' শব্দের বদলে যদি 'রয়েছে' শব্দটি থাকতো তা' হলে বোধ হয় আরও ভালো হতো। মনটা তখন থেকেই কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল তোমার মুখে শোনা 'মেঘদূত'-এর একটি শ্লোক। মনে আছে, রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ পড়াতে পড়াতে কথায় কথায় তুমি বলেছিলে? আমি লিখে নিয়ে মুখস্থ করেছিলাম। এখন দেখছি প্রথম দু'টো লাইন ভুলে গেছি। শেষের দু'টো লাইন মনে আছে—

পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষম্।
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥

মনে আছে তোমার? সেদিন একটি গোলাপ ফুল তোমার হাতে ছিল। সেটা আমাকে দেবার উদ্দেশ্যে ভুল করে ফেলে রেখে গিয়েছিলে? না থাকলেও দোষ দেবো না। দাতা কি তার দানের হিসাব রাখে? কী যেন সেই কবিতাটি, তুমি বলতে? সত্যিই আমার Memory এখন কমে গেছে।

পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে?
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি?

ছাখো তো ঠিক হয়েছে কি না? ……সত্যিই নিরালায় বসে তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে আর এখন সম্ভব নয়। যাক্, এখানেই শেষ করলাম। তুমি আমার প্রণাম অনুভব করবে। ইতি—

যতীশ বললো—দাদু, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি। চায়ের কথা বলে আসি। চাটুয্যে মশায় 'আচ্ছা' বলে হতভম্বের মতো বসে রইলেন। যতীশ ঘুরে এলে তিনি বললেন—ভায়া, আজ তা'হলে এই পর্যন্তই থাক্ না।

—না, না, তা' কি হয়? প্লট জমে উঠেছে। এক্ষুনি সবটা না শুনলে effect নষ্ট হয়ে যাবে যে। তা' হবে না দাদু। সবটা পড়া হলে তবে আপনার ছুটি।

ইতিমধ্যে চা এসে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে চাটুয্যে মশায় যেন নিরুপায়ভাবে বললেন—আচ্ছা, তবে শোনো।

……আমার মনের অবস্থা যে কেমন হয়েছে তা' তুমি কল্পনা করতে পারবে না। মনের আবেগে বা উত্তেজনায় আমি পিসীমার কাছে বলে ফেলেছি। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী না। আমি বোধ হয় খুব বড়ো একটা ভুল করলাম যা' আর শোধরাবার উপায় নেই। পরীক্ষার পরে বললে বোধ হয় ভালো হতো। পিসীমা কাঁদছেন আর বলছেন—আমি বারবার বলছি সব মোহ, ওসব কিছু না। দু'দিনেই ভুল ভেঙে যাবে। জানো তো আমাদের সংসারে পিসীমার স্থান কতখানি। বাবা থাকলে একমাত্র তিনিই পিসীমার মত করাতে পারতেন। বলো

তো এখন কী করি? ······তবে আমার কাতর অনুরোধ তুমি নিজে এদের কাছে প্রস্তাব করতে যেয়ো না। এরা গুণীর আদর বোঝে না। হয়তো তোমাকে অপমান করে বসবে। সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। আমি কিছুতেই তোমাকে এদের কাছে ছোট হতে দেবো না। উপায় কিছু থাকলে বোলো। তবে আমাকে কিন্তু তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে বোলো না। কাপুরুষের মতো রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়া,—এতে আমার মন সায় দেয় না। যা' করবো নির্ভয়ে সবার সামনে করবো। অন্যায় যখন আমাদের স্পর্শ করেনি তখন ভয় কিসের? তুমি বলতে পারো তবে, আমি প্রতিবাদ করছি না কেন? সব বুঝি কিন্তু কী জানো? এদের মুখের দিকে চাইলে মনটা দুর্বল হয়ে যায়। আমার জীবন নিয়ে আমার যেমন একটা সাধ আছে, এদেরও তেমনি একটা সাধ আছে। ······আশা করি আমাকে ভুল না বুঝে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পারবে। কারণ আমার মন ছিল মাটির তালের মতো। শিল্পীর মতো তুমি তাকে ভেঙেচুরে নূতন মূর্তি দান করেছ। ······আর এটা তো বোঝো, তোমার সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। হয়তো তোমার কপালে আমার চেয়েও ভালো মেয়ে জুটতে পারে। কিন্তু তোমাকে পেলে আমার যে কী লাভ হবে তা' কী করে বুঝিয়ে বলবো······ যাক্, আবার বলি সংসার নিয়ে একটু ভাবো। আমার ইচ্ছা নিজের হাতে সুন্দর করে ছোট্ট একটি সংসার গড়ে তোলা। হবে কি না কে জানে?

……একটা অভিযোগ আছে। তোমাকে বল্লাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা কোট কিনতে। তুমি সস্তা দামের একটা জিনিস কিনে বসলে। আসছে শীতে কিন্তু নতুন বেশে দেখতে চাই। ……আর গ্যাখো, আমাদের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবে। মনে হয় ভালোই হবে। অবশ্য একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। প্রণামান্তে ইতি।

এইখানি পড়া শেষ করে চাটুয্যে মশায় চুপ করলেন। যতীশ বললো—থামলেন কেন দাদু? শেষ করুন।

—এই তো শেষ করলাম।

—কৈ, না তো। আরও একখানা বাকী। বলেছিলেন সাতখানি চিঠি। এ তো ছয়খানা হলো।

চাটুয্যে মশায় চিঠির সংখ্যাটা নিজেই আগে বলে ফেলেছিলেন। সুতরাং এখন ফাঁকি দেওয়া মুস্কিল। থতোমতো খেয়ে বললেন—মানে, হিসেবে আর একখানা বাকী আছে ঠিক। তবে সেখানা না শুনলেও তোমার গল্প লেখা আটকাবে না।

—তা' হবে না দাদু।

—না, না, অন্য কোনো কারণ নয়। মানে, এই চিঠিখানা পড়লে দেখবে প্লটটা ঘুলিয়ে যাবে। আগের ছ'খানার সঙ্গে এর মিল কম। তাই বলছিলাম এই পর্যন্ত থাক্।

—না, আপনি পড়ুন। সে আমি ঠিক্ করে নেবো। আর তা' ছাড়া হয়তো গল্পের পরিণতির একটা আভাসও পেতে পারি।

অগত্যা চাটুয্যে মশায়কে রাজী হতে হলো। তিনি অপরাধীর মতো সপ্তম পত্রখানি খুলে পড়তে থাকেন আর বারংবার যতীশের মুখের দিকে চান৭

·······আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কোরো। আজ তুমি এসেছিলে কিন্তু লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে তোমার সামনে যেতে পারলাম না। পিসীমা শুধু বলছেন—তোমার এত অবনতি আমি কল্পনা করতে পারিনি। আর সে কি বুক-ফাটা কান্না! লজ্জায় ও ঘৃণায় আমি মরেই গেছি। হয়তো আত্মহত্যা করতে পারি। দাদা অবশ্য মুখে কোনো রাগারাগি করেনি। বলেছে—তোমার যা' খুশী করতে পারো। তবে আমি ওর মধ্যে নেই। কিন্তু এ তো রাগারাগির চেয়েও খারাপ।······দ্যাখো, আমি অনেক ভেবে দেখেছি এ বিয়ে হতে পারে না। আমি কিছুতেই তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না। আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ না ভেবে শুধু বর্তমানের পানে চেয়ে তোমার কাছে ধরা দিয়েছি। এখন দেখছি তোমাকে পেয়ে আমি কিছুতেই সুখী হবো না। কেন জানো? পাবো প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা কিন্তু প্রতি পদে ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ধিক্কার এসে আমার শান্তি ভঙ্গ করবে। যারা আমাকে এতদিন চোখের সামনে রেখে মানুষ করেছে তারাই আমাকে বিশ্বাস করছে না, অন্যে তো করবেই না।·· আচ্ছা, সত্যিই কি আমি অসতী? তোমাকে মন ছাড়া তো কিছু দিইনি; অবশ্য তুমিও চাওনি। আমাকে বুঝিয়ে দিও তো। এরা ওসব বোঝে না। রাধা পরস্ত্রী হয়েও শ্রীকৃষ্ণকে মন

দিয়েছিলেন। তবু লোকে তাঁর পূজো করে। আর আমি কারুর না হয়েও যদি তোমাকে মন দিয়ে থাকি তবে আমি ঘৃণা পাবো কেন? পিসীমা রাধাশ্যামের বিগ্রহ পূজো না করে জল-গ্রহণ করেন না, অথচ আমাকে বললেন অসতী। দাদা মনে মনে অরুন্ধতীকে ভালোবাসে। আমাকে পার করতে পারলে হয়তো তাকেই বিয়ে করবে। তার আয়ে সংসার চলে। সুতরাং তাকে কেউ বাধা দিতে সাহস করবে না। অথচ আমার বেলায় তিনি বিজ্ঞ অভিভাবক সেজে বসলেন। আমার লেখাপড়া-না-জানা পিসীমার এক পুরুষ আগেকার মতের সঙ্গে আমার লেখাপড়া-জানা আধুনিক দাদার মতের কোনো তফাৎ দেখতে পেলাম না। ......যাক্, তা' বলে বিয়ে তোমাকে করতে পারবো না। আমি ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করেছি। তাতে আমার কপালে যাই থাক্। আর ছাখো, আমাকে পেলে তুমিও সুখী হবে না। কারণ কি জানো? তোমার সঙ্গে আমার এত দুর্নাম রটেছে তা' আমি জানতাম না। সে কথা উচ্চারণ করবার আগে ইচ্ছা করে আমি বিষ খেয়ে মরি। লোকে বলে বাবা নাকি আমাকে দিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা রোজগার করেছে। আমার মৃত জন্মদাতার এত বড়ো অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। ......তোমার পায়ে পড়ি আমাকে আর বিয়ে করতে চেয়ো না। জানি তুমি আঘাত পাবে। কিন্তু উপায় কী? ক্ষমা কোরো। তোমার কত যত্নে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও অঙ্ক কষতে ভুল করলে, ট্রান্সশ্লেসন না পারলে বা পরীক্ষায় কম

নম্বর পেলে যেমন তুমি আমায় বারবার ক্ষমা করেছ তেমনি আজ আমায় ক্ষমা করতে হবে। আমি ক্ষমাপ্রার্থিনী হয়ে দাঁড়ালে আমানি তুমি বিমুখ করতে পারবে না। তুমি গুরু আমি শিষ্যা—এই আমাদের চিরদিনকার সম্পর্ক। মাঝখান থেকে দু'দিনের জন্যে কী হয়ে গেল। ····· হ্যাঁ শোনো, তুমি এ বাড়ীতে আর এসো না। দাদা তোমায় অপমান করতে পারে। তা' বলে তাকে কিছু বলতে যেয়ো না যেন। যে আমার মনের ব্যথা বুঝলো না, সে তোমায় বুঝতে পারবে কেন?······আর একটা কথা। ভয়ে ভয়ে বলছি। আমার চিঠিগুলি আমার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ো। ওগুলো তোমার কাছে থাকলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমার সর্বনাশ হতে পারে। তুমি যে রকম আপন-ভোলা, কোথায় কি ভাবে রাখবে ঠিক থাকবে না। কে কখন দেখে ফেলবে বা নিয়ে যাবে। ······ছাখো, আমাকে তুমি অনেক পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করেছ, এবার তোমার হাতে থেকে আমায় রক্ষা করো। ······চিঠিগুলি যদি নাই-ই পাঠাও, তবে পুড়িয়ে ফেলতে ভুলো না। আমার চরিত্রের ভালো-মন্দের প্রমাণ কিন্তু তোমার কাছেই রইলো।····· শোনো, যদি চুপি চুপি একটা অনুরোধ করি, রাখবে তো? পারো তো তোমার একখানা ফোটো পাঠিয়ে দিয়ো। সব শেষে তোমার কাছে একটি দাবী জানিয়ে চিরদিনের মতো (হ্যাঁ, হয়তো তাই) তোমার প্রীতির জগৎ থেকে তোমার স্মৃতির জগতে নির্বাসিত হতে চাই। আগের চিঠিতে আমাদের কাহিনী নিয়ে একখানা

উপন্যাস লিখতে বলেছিলাম। হ্যাঁ, লিখো। তবে আঘাত দিলাম বলে প্রতিশোধ নিও না কিন্তু। লিখতে বসে তোমার আঘাত-পাওয়া মন যেন তোমার শিল্পী-মনকে আচ্ছন্ন করে না ফ্যালে। তুমি লিখেছ—তোমার জন্যে সারা দুনিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি কিন্তু তোমার জন্যে তোমারই সঙ্গে সংগ্রাম করি কেমন করে? ঠিকই বলেছ। আমি তো সংগ্রামে হেরেই গেছি। যে হেরে গেল তাকে হারিয়ে যেতে দেওয়াই ভালো। তার সঙ্গে আর সংগ্রাম করে লাভ কী? তাই বলি—আমার চরিত্র আঁকতে গিয়ে আমাকে যদি এক ভীরুচিত্ত অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো করে আঁকো, আপত্তি করবো না। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে যেন রুচিহীনা ও মিথ্যাচারিণী করে এঁকো না। ইতি—

চিঠি পড়া শেষ করে চাটুয্যে মশায় যতীশের মুখের দিকে না চেয়ে মাথা নীচু করে হাতের কাগজগুলি ভাঁজ করতে লাগলেন।

যতীশ প্রৌঢ়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে বললো— দাদু, বুড়োকালে একবার কলম ধরুন না। খাসা প্লট। কিন্তু এ প্লট আমার চেয়ে আপনার হাতে ফুটবে ভালো।

ম্লান হাসি হেসে চাটুয্যে মশায় বললেন—তা' আর হয় না ভায়া। কোনোদিন যে চেষ্টা করিনি তা' নয়। লিখতে বসে ঐ শেষের অনুরোধ রক্ষা করে উঠতে পারলাম না। তাই বারবার লিখেছি আর ছিঁড়ে ফেলেছি। তারপর যতবার যত গল্প লিখতে গেছি মাথায় প্লটের জট পাকিয়ে গেছে। গল্প লেখা এ জীবনে আর হলো না। ছাখো ভায়া, তুমি যদি পারো।

---